অরুণাচলের অন্তরাগ: জনজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি

বিপ্লব নায়ক

ভূমিকাপর্ব: অস্তিনাস্তির সংকট

অরুণাচল প্রদেশ নামে বর্তমানে পরিচিত ভূখন্ডটি প্রাকৃতিক বৈচিত্রের প্রাচুর্যের বুনটে বোনা এক বিস্ময়কর স্থান। পাহাড়-নদী-জঙ্গল ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর এক নিবিড় মোজেয়িক-এর মধ্যে মানুষের ভাষা-সমাজরূপ-সংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারা এখানে প্রবাহিত। বিচিত্র পল্লব-মর্মর, ঝোরা-নদী-প্রস্রবণ-এর বিচিত্র জলধ্বনি, পাখির বিচিত্র কুঞ্জন, প্রাণীদের বহু স্বর— এই সবের সঙ্গেই মিশে আছে এখানকার মানুষদের অসংখ্য কথ্য ভাষা। সর্বশেষ ভাষাতাত্ত্বিক নিরীক্ষণে এই অঞ্চলে প্রায় ১৬৫০-টি কথ্যভাষার রূপ চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রত্যেকটি কথ্যভাষার আবার এলাকা বিশেষে আঞ্চলিক রূপের ভিন্নতা চিহ্নিত করা যায়। ভাষা-সর্বেক্ষণকারীরা এই সমস্ত কথ্যভাষার মধ্য থেকে ৮২টি মূল ভাষারূপ চিহ্নিত করে তাদের তিব্বতী-বর্মী ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সমস্ত ভাষার আধারে সঞ্চিত রয়েছে মৌখিক লোকসাহিত্যের বিপুল ভান্ডার, যার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়ে চলেছে লোকইতিহাসের বিবরণ, লোকজ্ঞানের প্রসারণ।

এই সম্পদসম্ভার আজ বিপদের মুখে। বহু ভাষার বাচক কমতে কমতে এত কমে গেছে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে এত কম তা প্রবাহিত হচ্ছে যে অচিরেই বাচকহীন হয়ে গিয়ে তা পুরোপুরি লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিপন্ন ভাষা বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও এই আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে এই অঞ্চলের যে যে ভাষাগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় বিপন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তা এইরকম:

চরম সংকটে (critically endangered) **যে সব ভাষা**

ভাষার নাম	কোন অঞ্চলে কথিত হয়	বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)
নাহ	সুবানসিরির উপর দিক	৩৫০
তাঙ্গাম	পশ্চিম সিয়াঙ	১০০
ম্রা	সুবানসিরির উপর দিক	৩৫০
মেয়োর	আনজাও জেলা	৫০০

নিশ্চিত সংকটে (definitely endangered) **যে সব ভাষা**

ভাষার নাম	কোন অঞ্চলে কথিত হয়	বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)
ডাকপা	তাওয়াঙ	১,০০০
লিসফা	তাওয়াঙ	১,৫০০
খোয়া/উগুন	পশ্চিম কামেঙ	১,০০০
মিজি	পশ্চিম কামেঙ	৫,০০০
কোরো	পশ্চিম কামেঙ	৮০০– ১,০০০
সুলুঙ	পূর্ব কামেঙ	৬,০০০
পার্বত্য মিরি	সুবানসিরির উপর দিক	১২,০০০
বোরি	পশ্চিম সিয়াঙ	২,০০০
খাম্বা	পশ্চিম সিয়াঙ	১,৫০০
মিলাঙ	পূর্ব সিয়াঙ	২,০০০
পাসি	পূর্ব সিয়াঙ	১,০০০
ইদু	দিবাঙ উপত্যকা	১১,১০০
সিঙফো	চাঙলাঙ	৫০০০
মোতোউ মেম্বা	পশ্চিম সিয়াঙ	৯০০০
বোকার	পশ্চিম কামেঙ	৫,০০০
শেরডুকপেন	পশ্চিম কামেঙ	৩,০০০
মিজু	লোহিত ও আনজাও	৬,৭০০

সংকটের মুখে (vulnerable) **যে সব ভাষা**

ভাষার নাম	কোন অঞ্চলে কথিত হয়	বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)
ৎসাঙলা	তাওয়াঙ ও পশ্চিম কামেঙ	৫৫,০০০
নিশি	সুবানসিরির নিচের দিক, কুরুঙ কুমে	১,৭০,০০০
বাঙনি/বাঙরু	কুরুঙ কুমে	২০,০০০
আপাতনি	সুবানসিরির নিচের দিক	৩৫,০০০
তাগিন	সুবানসিরির উপর দিক	৩০,০০০
গালো	পশ্চিম সিয়াঙ	৩৫,০০০
আদি	পূর্ব সিয়াঙ ও উত্তর সিয়াঙ	১,৭০,০০০
পদম	পূর্ব সিয়াঙ ও দিবাঙ উপত্যকার নিচের দিক	২০,০০০
খাম্পতি	লোহিত	১৩,০০০
তাঙসা	চাঙলাঙ	৪০,০০০
নকটে	তিরাপ	৩৩,০০০
ওয়ানচো	লঙডিঙ	৪৯,০০০
কুয়োনো মেম্বা	তাওয়াঙ	৫০,০০০

দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চরম সংকটের মধ্যে ৪টি ভাষা, নিশ্চিত সংকটে ১৭টি ভাষা আর সংকটের মুখোমুখি ১৩টি ভাষা। এই ভাষাগুলোর বিপন্নতার প্রধান দিক হলো এই যে তার বাচকগোষ্ঠীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সব ভাষার ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে, অর্থাৎ, নতুন প্রজন্ম বেশি বেশি করে তার ব্যবহারের ভাষা হিসাবে অন্য ভাষাকে গ্রহণ করছে। সেই অন্য ভাষা কী ? সেই অন্য ভাষা হলো অসমিয়া, হিন্দি বা ইংরেজি। কিন্তু নতুন প্রজন্ম কেন বেশি বেশি করে অসমিয়া, হিন্দি বা ইংরেজি গ্রহণ করছে ?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের এই সমস্ত বাচকদের সামাজিক জীবন বর্তমানে যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার দিকে তাকাতে হবে। এই ভাষাগুলোর বাচক অরুণাচল প্রদেশের যে সমস্ত বিভিন্ন জনজাতির মানুষ, দীর্ঘদিন ধরে তারা স্বকীয় বৈশিষ্টপূর্ণ সমাজরূপ ও জীবনযাপনপদ্ধতি গড়ে তুলে পরম্পরাগতভাবে তা বহন করে চলেছে। এই

সমাজরূপ ও জীবনযাপনপদ্ধতির স্বকীয় ক্ষেত্রজুড়ে বিস্তৃত তাদের ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্র। যেমন, তাদের সমাজ-রাজনৈতিক অনুশাসনের পীঠ ছিল প্রতিটি গ্রামের গ্রাম-পরিষদ, যেখানে অংশ নেওয়া বা যা সম্পর্কিত বিধি-নিয়ম শ্রুতিমাধ্যমে বয়স্কদের মধ্যে সঞ্চিত থাকা বা তরুণদের মধ্যে প্রবাহিত হওয়া, সবই হতো তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের সমাজে লোকজ্ঞানের নতুন প্রজন্মে প্রসারণ যেভাবে গ্রামপরিষদের সভা, অবিবাহিত পুরুষদের ও মেয়েদের যৌথ থাকার ঘর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঘটত, সেখানেও তার মাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই ছিল মাতৃভাষা।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত এই সমাজরূপ ও জীবনপদ্ধতি আজ ভাঙনের মুখে। গ্রামপরিষদে গণ-অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজ-রাজনৈতিক অনুশাসন ক্রমশই প্রতিস্থাপিত হচ্ছে শহরে কেন্দ্রীভূত অভিজাত দ্বারা নির্বাহিত শাসনে, যে অভিজাতদের পিছনে আবার রয়েছে সুদূর দিল্লীতে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতার শক্তি। সুদূর ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত এই নব্য শাসনব্যবস্থায় লিখিত দলিল-দস্তাবেজ-আপিল-নির্দেশ-এ বাঁধা রীতিনীতিতে অসংখ্য লিখনরীতিহীন কথ্য ভাষার কোনও স্থান নেই, আইন-প্রশাসনের ভাষা হিসাবে সেখানে বিরাজ করছে সবার উপরে ইংরেজি, তার নিচের ধাপে হিন্দি ও তার নিচের ধাপে অসমিয়া। ফলে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার ধাপবন্দী কাঠামোর তলার দিকের ধাপগুলোয় স্থান করে নেওয়া আঞ্চলিক অভিজাতদের সরণ ঘটছে ওই অসমিয়া, হিন্দি, ইংরেজির দিকেই। অসমিয়া, তার থেকে বেশি হিন্দি ও সবচেয়ে বেশি ইংরেজি-তে দখল হয়ে উঠছে গ্রামসমাজগুলোর ভাঙতে থাকা অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার হাতিয়ার।

এই প্রক্রিয়ারই সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামসমাজে যে ভাবে লোকজ্ঞানের সঞ্চয় ও প্রসারণ মাতৃভাষার আধারে লোকশ্রুতির মাধ্যমে ঘটত, গ্রামের শামান ও বয়স্করা সেই জ্ঞানের ভান্ডার ও প্রবাহক হিসাবে ভূমিকা নিত, তাকে অস্বীকার করে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত একটি প্রমিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাপ্রদানের জন্য স্কুল-ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এই স্কুল-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৯৫৭ সালে ভেরিয়ার এলউইন-এর পর্যবেক্ষণ ছিল এইরকম:

> ...আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব চরিত্র যাতে নষ্ট করে দেওয়া (detribalization) না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু এতদিন অবধি আমাদের স্কুল এবং তার শিক্ষকরা এমন হয়েছে যা তা খেয়াল রাখার বদলে সেই বিপদটিকেই ঘটিয়েছে। স্কুল ও শিক্ষকদের আদিবাসীদের জীবন অনুযায়ী বদলানো বা আদিবাসীদের জীবনধারার স্বাদ তাতে নিয়ে আসার কোনও আন্তরিক চেষ্টা হয় নি। স্কুলবাড়ির আদল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একই পোষাক, শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে টাঙানো ছবি বা চার্ট, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ভাষা, খেলাধুলো— সবই আঞ্চলিক জীবনে অপরিচিত, বেমানান। তার ফল হয়েছে এই যে, স্কুলগুলো গ্রামজীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠার বদলে আলাদা হয়ে থেকেছে, এমনকি আদিবাসীদের পরম্পরার প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন হয়ে থেকেছে। আমাদের স্কুলে এমন কিছু ছিল না যা একটি আদিবাসী শিক্ষার্থীর মনে তার জনজাতির নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে গর্ববোধ জাগাতে পারে, বরং এমন সবই ছিল যা তা সম্পর্কে তাকে লজ্জায় হীনমন্য করে তোলে।...আদিবাসী জনজাতিদের বয়স্ক জনেরা কখনও কখনও আশঙ্কা করে যে স্কুলগুলোর ফলে তাদের সমাজের পরম্পরাগত প্রাধিকারের প্রতি সম্মান ভেঙে পড়বে এবং স্কুলে যাওয়া ছেলে মেয়েরা তাদের সমাজের কোনও কাজে লাগবে না।

খেয়াল করা যেতে পারে যে, অরুণাচল প্রদেশের স্কুলগুলো সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণ ভেরিয়ার এলউইন করেছিলেন যখন তিনি সেখানে (তদানীন্তন NEFA-য়) সরকারি প্রশাসনের উপদেষ্টা হিসাবে বহাল ছিলেন এবং এই পর্যবেক্ষণ সমন্বিত বইটি (A Philosophy For NEFA) দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কাজ করতে যাওয়া সরকারি প্রশাসকদের প্রশিক্ষণে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এলউইন নিজে বেশ কিছু চেষ্টা করেছিলেন এই অবস্থা বদলানোর জন্য। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও কিছু বদল হয় নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জনজাতিদের মাতৃভাষাগুলো শিক্ষার মাধ্যম হয় নি। আদিবাসী গ্রামসমাজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে কোনও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব স্থান পায় নি। আজ ইংরেজি প্রায় একাধিপত্য করছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এবং সেই ইংরেজি-শিক্ষার পথ হয়ে উঠেছে গ্রামসমাজের পরম্পরা ত্যাগ করে সেই শহরকেন্দ্রিক অভিজাতকুলের অংশীভূত হওয়ার প্রবেশিকা, যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষীগত ও কেন্দ্রীভূত করার কুশীলব হয়ে উঠেছে। গ্রামসমাজের ভাঙনের উপর ধাপবন্দী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমপ্রসারের অনুসারী এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাই আধিপত্যকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রতাপ-প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার ও নিজ নিজ মাতৃভাষা থেকে সরণও তাই বেড়ে চলেছে।

আদিবাসী জনজাতিদের মাতৃভাষাগুলোর সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র হারানো, গণধারণায় অসম্মানের বস্তু হয়ে ওঠা ও শেষাবধি বাচকদের মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়া— এই ঘটনাগুলো আদিবাসীদের গ্রামসমাজের পরম্পরাগত কাঠামোর যে বিপর্যয়ের বা ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে ঘটে চলেছে, সেই বিপর্যয় বা ভেঙে পড়ার চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন। সেই অর্থনৈতিক পরিবর্তন হলো তাদের পরম্পরাগত স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশের ধারা পরিত্যক্ত হয়ে শুকিয়ে আসা এবং বৃহৎ পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদকদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা পর-নির্ভরশীল ভোগবাদী অর্থনীতির বিকশের ধারায় বাঁধা পড়া। পরম্পরাগত ধারায় ঘর, রাস্তা, সেতু এই সমস্ত নির্মাণের আঞ্চলিক প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল যৌথশ্রমে নির্বাহিত উপায় চালু ছিল। এর পরিবর্তে সরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষণায় চালু করা হয়েছে ও হচ্ছে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদিত সিমেন্ট-ইস্পাত-

লোহা ও অন্যান্য কাঁচামাল ব্যবহার করে পেশাদার নির্মাণকারী সংস্থাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্ধতিতে নির্মাণকাজ, যার ফলে এই নির্মাণকাজে আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ন্ত্রণ বা স্বনির্ভরতা কোনওটাই আর থাকছে না। একইভাবে, স্থানীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব ও আবর্তনচক্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি-ব্যবস্থা, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ, শিকার ও পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের পরম্পরার মধ্য দিয়ে জীবনের রসদ সংগ্রহের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তাকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা হচ্ছে সরকারি 'উন্নয়ন'-এর মধ্য দিয়ে। সরকারি ডোল ও নির্দেশাবলী অস্ত্র করে সরকারি উন্নয়ন-আধিকারিকরা জারি করছেন রাসায়নিক সার ব্যবহার করে বাণিজ্যিক চাষ ও পুঁজিবাদী ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হচ্ছেন পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী, আমানতকারী, মহাজন-দের পল্টন। টাকা যেমন গ্রামে ঢুকছে, তেমন হু হু করে বেরিয়েও যাচ্ছে। নবসৃষ্ট এক অভিজাতগোষ্ঠীর হাতে টাকা জমা হয়ে আবার তা পুঁজিবাদী ভোগ্যপণ্য খরিদের মধ্য দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে। আর এর ফলে ভেঙে পড়ছে কৃষিজমি ব্যবহারের উপর সমগ্র গ্রামের মানুষের নিয়ন্ত্রণের পরম্পরাগত ব্যবস্থা, ভেঙে পড়ছে কৃষি-উৎপাদের বন্টনে গ্রামের সব মানুষের ভাগ থাকার পরম্পরাগত ব্যবস্থা। অর্থাৎ, উৎখাত হতে হতে যাচ্ছে উৎপাদন ও বন্টনের উপর গ্রামসমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত পরম্পরা। অর্থনৈতিক জীবনেও তাই গ্রামসমাজের যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ অংশগ্রহণের পরম্পরাগত পরিসরগুলো ধ্বংস হয়ে পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ও পুঁজিবাদী বাজারের উপর নির্ভরতাই প্রধান হয়ে উঠছে। যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ অংশগ্রহণের পরিসরগুলো ছিল জনজাতিদের নিজেদের ভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র, আর পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ-নির্ভরতার পরিসরটি হলো ইংরেজি বা হিন্দির মতো আধিপত্যকারী ভাষার ক্ষেত্র। জনজাতিদের ভাষাগুলোর মৃত্যুঘন্টা এভাবেও বেজে উঠছে।

এই প্রক্রিয়াই কি চলতে থাকবে ? অনেকে বলে থাকেন যে এই প্রক্রিয়াই কাম্য, কারণ তাঁরা মনে করেন যে প্রগতির একমেবাদ্বিতীয়ম সরণি এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি এই পথ প্রগতির পথ ? অরুণাচল প্রদেশের বহু বিবিধ জনজাতির বহু-বিবিধ ভাষা-সংস্কৃতি বিলোপের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে বাঁধা একটি শিকড়হীন জনগোষ্ঠী তৈরি মানে কি আগের থেকে ভালো হওয়া ? যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও যৌথ অংশগ্রহণের পরিসরে উৎপাদন ও বন্টনের পরিবর্তে ভোগবৃদ্ধির অসীম তাড়নায় তাড়িত পুঁজিবাদী উৎপাদন কি আগের থেকে ভালো ব্যবস্থা ?

এই প্রশ্নগুলো তুলতে গেলেই প্রগতির বাঁধা পথের পথিকরা দাবড়ানি দিয়ে বলবেন, থামো বাপু, অতীতকে নিয়ে আর সস্তা কাব্যি কোর না। তাঁরা মনে করিয়ে দেবেন যে অরুণাচল প্রদেশের জনজাতিদের অতীত ইতিহাস আসলে অসভ্যতার ইতিহাস, অক্ষমতা-পশ্চাদপদতার ইতিহাস, জনজাতি-জনজাতিতে প্রাণঘাতী সংঘাত আর নরমুন্ড শিকারের ইতিহাস। ভয়াল-ভয়ঙ্কর সেই অন্ধকার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনাই চলতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হলো যে তাঁরা অতীতকে এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছেন যে সেখানে কিছু ঠাহর করাই যায় না। বহু শতাব্দীর মানুষের শ্রম-মনন-কীর্তির পথ বেয়ে চলেছে আদিবাসী-জনজাতিদের যে সমাজগুলো, পরস্পর হানাহানি আর নরমুন্ড-শিকার-ই তার শেষ কথা ? অজ্ঞানতার এই অন্ধকারকে কিছুটা ফিকে না করতে পারলে তাই সত্যিই পূর্বের জরুরী প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

আমরা তাই দৃষ্টিকে একটু নিবিড় করে এখন দেখার চেষ্টা করব অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন জনজাতির ইতিহাস, বোঝার চেষ্টা করব তাদের পরম্পরাগত গ্রামসমাজের কাঠামোর মধ্যে ধৃত ছিল ভাষা, সংস্কৃতি, লোকপ্রজ্ঞার কী সম্পদ। তারপর হয়ত আমরা ফিরতে পারব প্রগতি সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্নগুলোর বিবেচনায়।

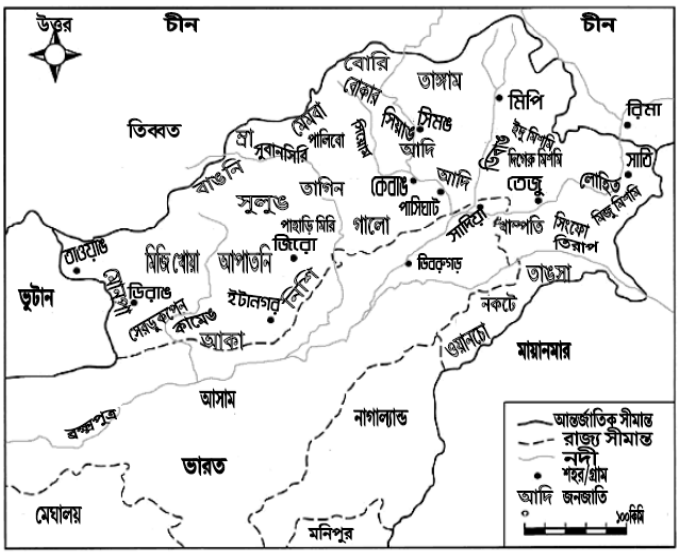

মানচিত্র: অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন উপজাতির বসবাসের অঞ্চল

আদি, আপাতনি, মিশমি, তাঙসা, নিশিং, তাগিন, তাওয়াং, সেরডুকপেন, মোনপা, মেয়োর, টুটসা ইত্যাদি প্রায় ২৬-টি জনজাতিগোষ্ঠী অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা, যারা আবার প্রায় ৭০-টি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। আমরা একে একে তাদের সঙ্গে পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করব। শুরু করা যাক আদি জনজাতিদের দিয়ে।

প্রথম পর্ব: আদি জনজাতির কথা

আদি জনজাতির মানুষরা বাস করে অরুণাচল প্রদেশের মাঝ-বরাবর অবস্থিত সিয়াঙ জেলায় সিয়াঙ ও সিয়াম নদীর অববাহিকা ঘিরে। আসামের উপত্যকার অধিবাসী ও ঔপনিবেশিক বা তৎপরবর্তী শাসকরা এদের 'আবোর' বলে ডাকত। 'আবোর' কথাটার মানে অবাধ্য, অদম্য বা বিশৃঙ্খল। আদিরা নিজেরা কখনোই এই নামে নিজেদের পরিচয় দিত না, এখনও দেয় না। আদি হিসাবেই তারা তাদের নিজেদের পরিচয় দেয়। তাই আমরাও আদি জনজাতি হিসাবেই তাদের পরিচয় চিহ্নিত করব। কিন্তু শাসকপক্ষের দিক থেকে দেওয়া 'আবোর' নামটার মধ্যে কিছু ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। সেই ইঙ্গিত থেকেই কথা শুরু করা যাক। শাসকপক্ষীয়দের চোখে যারা অবাধ্য, অদম্য বা বিশৃঙ্খল, তারা নিশ্চয়ই শাসকদের সঙ্গে কোনও

দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে গেছে। আদি জনজাতির ক্ষেত্রে তেমন কী ঘটেছিল বোঝা যাক।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এবং আদি জনজাতির মধ্যে প্রথম সংস্পর্শের চিহ্ন হিসাবে চারটি চিত্রকে সামনে রেখে আলোচনা শুরু করা যায়। চিত্রগুলি এখানে চিত্র- ১,২,৩,৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথম আলোকচিত্রটি ধর্মপ্রচারক রেভারেন্ড এডওয়ার্ড এইচ হিগস-এর তোলা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিবরুগড়-এর কাছে কোনও জায়গায়। চিত্রগ্রাহকের রেখে যাওয়া চিত্র-বিবরণ থেকে জানা যায় যে ছবিটি আবোর গোষ্ঠীর মানুষদের একজন গোষ্ঠীপ্রধান-এর কন্যার ছবি, ডিবরুগড়-এর উত্তরে যে পাহাড়ি অঞ্চল, সেখানে তাদের বাস।

দ্বিতীয় আলোকচিত্রটি অভিযাত্রী ডুগাল্ড ম্যাক্‌টাভিস লুমসডেন-এর তোলা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। চিত্রগ্রাহকের রেখে যাওয়া চিত্র-বিবরণ থেকে জানা যায় যে দৃশ্যটি কেবাঙ গ্রামের গ্রামপরিষদের। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে সম্মিলিত গ্রামের মানুষদের মধ্যে বক্তব্য রাখছেন একজন, তিনি হলেন 'গম', বা গ্রামপ্রধান। কেবাঙ গ্রামটি আদি জনজাতিদের বসবাসের অঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম।

চিত্র-১ (১৮৫৯ খৃঃ)

চিত্র-২ (ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ খৃঃ)

চিত্র-৩ (৯ ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃঃ)

চিত্র-৪ (জানুয়ারি, ১৯১২ খৃঃ)

তৃতীয় আলোকচিত্রটি এর দুই বছর পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ইংরেজদের সামরিক বাহিনীর কর্তা ক্যাপ্টেন ডি এইচ আর গিফোর্ড-এর তোলা বাহিনীর 'আবোর এক্সপিডিশন' এর স্মারক হিসাবে। ছবিটিতে পিছনের দিকে একটি গ্রামকে আগুনে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামটি ওই কেবাঙ গ্রাম। চিত্র-বিবরণী থেকে জানা যায় যে ছবিটির সামনের দিকের উর্দিধারীরা সব ইংরেজদের 'অষ্টম গুরখা রাইফেলস'-এর জওয়ান যারা ইংরেজ শাসকদের পরিকল্পিত 'আবোর এক্সপিডিশন' বাস্তবায়িত করার জন্য কেবাঙ গ্রামটিকে ছারখার করে পুড়িয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ আলোকচিত্রটি ঠিক তার পরের মাসে, অর্থাৎ ১৯১২-র জানুয়ারিতে তোলা। ছবিটি কার তোলা জানা যায় না, কেবল চিত্র-বিবরণী থেকে জানা যায় যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে সিয়াঙ-এর রিগা ক্যাম্পে বন্দী আবোরদের। অনুমান করা যায় যে 'আবোর এক্সপিডিশন'-এ ইংরেজ বাহিনী যে আদি মানুষদের বন্দী করে এনেছিল তাদেরই এখানে দেখা যাচ্ছে। ছবিটিতে পুরুষ, মহিলা, শিশু সবাইকেই দেখা যায়।

প্রথম দুটি ছবিতে যদি অজানা অপর এক মানবগোষ্ঠীর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি প্রধান হয়, তাহলে পরের দুটিতে প্রধান অপরকে পদানত করে আধিপত্যবিস্তারের হিংস্র উল্লাস। আর কৌতুহল থেকে হিংস্রতা অবধি এই যাত্রা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ঘটেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রের সূত্রে আমরা আদিদের গ্রামপরিষদ, গ্রামপ্রধান, গোষ্ঠীপ্রধান কথাগুলোকে পাচ্ছি। কী এদের তাৎপর্য? ভেরিয়ার এলউইন-এর ১৯৫৮ সালে লেখা 'এ ফিলজফি ফর নেফা' বইতে আদিদের গ্রামপরিষদ সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। আদিদের ভাষায় এই গ্রামপরিষদকে 'কেবাঙ' বলে। উইলকক্স নামের এক ইউরোপীয় অভিযাত্রীর সাক্ষ্য এলউইন উদ্ধৃত করেছেন কেবাঙ সম্পর্কে বলতে গিয়ে। উইলকক্স ১৮২৫ সালে আদি জনজাতির গ্রামে গিয়েছিলেন এবং কেবাঙ-এর সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, একজন গ্রামপ্রধান বা 'গম' কয়েকবার হাঁক পেড়ে গ্রামের মানুষকে সভায় ডাকে। সবাই সমবেত হলে গম প্রথাগত ভঙ্গিতে সকলের কাছে তার বক্তব্য সবিস্তারে রেখে আলোচনার সূচনা করে। এই বক্তব্য রাখার সময় সে একটানা দাঁড়িয়ে তার ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকে। এরপর সবাই বিতর্কে অংশ নেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শেষে ভোট হয়। সবার সমান ভোট, তবে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারও কারও অন্যদের চেয়ে বেশি।

উইলকক্স-এর এই বিবরণের পর এলউইন উদ্ধৃত করেছেন ফাদার ক্রিক-এর বিবরণ। ধর্মপ্রচারক ফাদার ক্রিক ১৮৫৩ সালে, অর্থাৎ উইলকক্স-এর ২৮ বছর পরে আদিদের গ্রাম মেম্বো-তে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কেবাঙ-এর সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, সভা হচ্ছিল এক বড় সভাঘরের মধ্যে, সভাঘরের কেন্দ্রে একটি বৃত্ত তৈরি করে বসেছিলেন ছয়জন গ্রামপ্রধান, যাদের পরিধানে জাঁকজমকপূর্ণ প্রথানুগ পোষাক। সেই বৃত্তকে ঘিরে সমবেত গ্রামের পুরুষরা। সভায় বক্তৃতা হল, সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য ভোট হল এবং তারপর প্রধানজনেরা বাকি সভার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য। ক্রিক-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তমনস্ক পুরুষই কেবাঙ-য়ে অংশ নেওয়ার অধিকারী, কিন্তু গ্রামের মহিলারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতিটি গ্রামই স্বয়ংশাসিত ও স্বাধীন এবং কেবাঙ-ই হল সেই স্বয়ংশাসনের কেন্দ্র। প্রতিটি গ্রামে গ্রামবাসীরা পাঁচ থেকে ছয়জন গ্রামপ্রধান নির্বাচন করে। নির্বাচিত গ্রামপ্রধানরা সাধারণত আজীবন কেবাঙ-এর সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে ও যৌথজীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে নেতৃত্ব দেয়। কোনও একজন প্রধানের মৃত্যু হলে, তার ছেলেই যে তার স্থলাভিষিক্ত হবে, তার কোনও মানে নেই, গ্রামবাসীরা আবার নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ করবে। ক্রিক দেখেছিলেন যে প্রতি সন্ধ্যায় সমস্ত পুরুষ সমবেত হয় কেবাঙ-এর সভাঘরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য। সেই আলোচনার বিষয় হতে পারে: ১।একে অপরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান, ২।কোনও গ্রামপ্রধানের ওঠানো রাজনৈতিক প্রশ্ন ধরে আলোচনা, ৩।পরের দিন গ্রামবাসীদের কাজের পরিকল্পনা। এই আলোচনার শেষে প্রতিদিন রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে তরুণ যুবকরা গ্রাম ঘুরে হেঁকে ঘোষণা করে দেয়— 'কাল শিকারের দিন', বা, 'কাল মাছধরার দিন', বা, 'কাল ক্ষেতে কাজের দিন', বা, 'কাল গেন্না (অর্থাৎ গণঅবসরের দিন)'! সেই অনুযায়ী গোটা গ্রামের যৌথজীবন পরের দিন নির্বাহিত হয়। ক্রিক লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রামের একটি নিজস্ব পাহারাদার বাহিনী আছে ১৮ বছরের বেশি সমস্ত তরুণদের নিয়ে। গ্রামের অবিবাহিত সমস্ত তরুণ যৌথভাবে একটি বড় ঘরে থাকে, অবিবাহিত তরুণীদের জন্যও আলাদা একটি বড় যৌথঘর আছে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে দুইজন ইউরোপিয় পর্যবেক্ষকের চোখে ধরা এই ছবির থেকে সাধারণ বিষয় হিসাবে উঠে আসে আদিদের গ্রামগুলোর স্বায়ত্তশাসনের গণ-রাজনৈতিক পরিসর। যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও যৌথভাবে তা কার্যকরী করার একটি লোকপরিসর আদিরা নির্মাণ করেছিল ও বহাল রেখেছিল। তাই তাদের অবাধ্য/বিশৃঙ্খল অর্থাৎ আবোর বলা যায় কোন যুক্তিতে? ক্রিক তাঁর পর্যবেক্ষণে আদিদের নিজেদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার প্রতি প্রেম ও দায়বদ্ধতার বোধেরও উল্লেখ করেছিলেন। তাই বাইরের আধিপত্যবাদী শাসক যখন তার কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য আদিদের পদানত করতে চেয়েছে, আদিদের স্বায়ত্তশাসনের লোকপরিসরকে খর্বিত করতে চেয়েছে, তখন আদিরা স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিরোধ করেছে তীব্রভাবে, প্রয়োজনে সশস্ত্রভাবে। শাসকদের বা আধিপত্য-বিস্তারেচ্ছুদের চোখে তাদের অবাধ্যতা বা বিশৃঙ্খলা বোধহয় এইখানেই।

উইলকক্স ও ক্রিক-এর বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনই কিছু পার্থক্যও আছে। যেমন, উইলকক্সের বর্ণনা অনুযায়ী, গ্রামপ্রধান প্রয়োজন অনুসারে হাঁক দিয়ে কেবাঙ-এর সভা ডাকে, আর ক্রিক-এর বর্ণনা অনুযায়ী, প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেবাঙ বসার রীতি চালু আছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এই যে ক্রিক বলেছেন যে কেবাঙ-এ মহিলাদের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না, উইলকক্স তেমন কিছু বলেন নি। এই পার্থক্য পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণের আংশিকতার জন্য হতে পারে, আবার এ কারণেও হতে পারে যে বিভিন্ন আদি গ্রামের মধ্যে রীতি-নীতি-সংস্কারে মূলগত সাদৃশ্যের উপর দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্যও আছে। দ্বিতীয়টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ আদি জনজাতিদের সবার মধ্যেই মহিলাদের কেবাঙ-এ অংশগ্রহণের অধিকার নেই এমনটা বলা যায় না, যেমন, আদিদেরই একটি উপগোষ্ঠী, মিনইয়ঙদের মধ্যে দেখা যায় যে কেবাঙ-য়ে অংশগ্রহণ করায় মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে, এমনকি গ্রামপ্রধানও নির্বাচিত হচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলোর জন্যই আদি জনজাতি বলতে সমরূপীয় একধাঁচায়-বাঁধা কোনও মানবগোষ্ঠীর ধারণা করা ভুল হবে। আদি জনজাতি তার আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিন্যস্ত। এই সমস্ত উপগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্বের একটি প্রধান নির্দেশক হল তাদের ভাষার পার্থক্য।

আদি ভাষা বলে কোনও একটি ভাষাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, আদি জনজাতির বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মাতৃভাষা পরস্পরের কাছাকাছি, আবার পরস্পরের থেকে পৃথক। দীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল জুড়ে এই উপগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব গোষ্ঠীনামও চালু আছে। এই বৈচিত্রের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় করা যাক।

আদি জনজাতির উপগোষ্ঠীগুলো হল:

১। বোকার

সিয়াঙ জেলার উত্তর-পশ্চিমে ৪০-টি গ্রামে বোকারদের বাস। ১৯৮১-র জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৩,০৫২। তারা নিজেদের কার্বো কৌমের (ক্ল্যান-এর) উত্তরপুরুষ বলে মনে করে।

২। বোরি

সিয়াঙ জেলার উত্তর-পশ্চিমের দুর্গম অঞ্চলে ১২-টি গ্রামে বোরিদের বাস। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ১,৮৫২। পশম ও কার্পাস তন্তু দিয়ে বস্ত্রবয়নে তারা দক্ষ। শিকার ও মাছধরা তাদের আদি জীবিকা। এছাড়াও এরা মিনইয়ঙ, গালঙ ও পশ্চিমের অন্য গোষ্ঠীদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে মধ্যস্থতা করে।

৩। কারকো

সিয়াঙ জেলার পূর্বদিকে সিয়াঙ নদীর ডানপাশে ১৬৭০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ৬-টি গ্রামে কারকোদের বাস। ১৯৮১-র জনগণনা অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১,৭৯৫। এরা নানা কৌমে (ক্ল্যান-এ) বিভক্ত। প্রতিটি কৌমের পৃথক আদিপুরুষ আছে, যে আদিপুরুষ থেকেই বংশানুক্রমে সেই কৌমের বিস্তার বলে তারা মনে করে। এই আদিপুরুষকে তারা বলে বোটুঙ। একই কৌমের মধ্যে 'পিনমিক' নামে নানা উপভাগে এরা বিন্যস্ত। কারকোরা নিজেদের মধ্যে, কিন্তু একই কৌমের বাইরে বিবাহ করে।

৪। মিলাঙ

সিয়াঙ জেলার মারিয়াঙ উপভাগের ৩-টি গ্রামে মিলাঙদের বাস। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ২,৫৯৫। 'মিলাঙ' নামে এক আদিপুরুষ থেকে বংশানুক্রমে তাদের বিস্তার বলে তারা মনে করে। তাদের লোকশ্রুতি অনুযায়ী, এই মিলাঙ জগতের প্রথম পুরুষ 'পেডঙ'-এর বংশধর, সেই বংশধারা এইরকম:

পেডঙ —> ডোডির—> ডিরবো—> বোমি—> মিলাঙ।

৫ ও ৬। মিনইয়ঙ ও পদম

আদিদের মধ্যে একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হল মিনইয়ঙরা। সিয়াঙ জেলার পশ্চিমে সিয়াঙ নদীর দুই দিকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের প্রায় ৭০-টি বড় গ্রাম। এই গ্রামগুলোতে প্রায় ৪০০-টি ঘরে তাদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭,০০০। তারাও নানা কৌমে বিভক্ত। তাদের সমাজে মহিলারা উচ্চ অবস্থান ভোগ করে। মহিলা শামান এবং কেবাঙ-এ মহিলা গ্রামপ্রধান দেখা যায়। সমরপ্রিয় ও সমরদক্ষ জাতি হিসাবেও তাদের খ্যাতি আছে। বিশ শতকের মাঝবরাবর অবধি (ভারত সরকারের দ্বারা দাসপ্রথা বিলোপের উদ্যোগের আগে অবধি) তাদের সমাজে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ভাবে দাস রাখার প্রচলন ছিল। যুদ্ধবন্দী অন্য জাতির মানুষ ছাড়াও, আদিদেরই অন্য একটি গোষ্ঠী 'পদম'-দের দাস করে রাখার চল ছিল। দাস হিসাবে রাখা মানুষজন বদ্ধশ্রম দিতে বাধ্য হতো, এছাড়া তারা গৃহস্থালির সাধারণ জীবনের অংশ হয়েই থাকত। পূর্বোল্লেখিত ধর্মপ্রচারক ক্রিক ১৮৫৩ সালে তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে পদমদের 'দাস' বললে তারা রেগে যায়, তারা নিজেদের স্বাধীন বলেই মনে করে, মিনইয়ঙদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে তারা স্বাভাবিক বলেই মনে করে। বর্তমানে পদমদের জনসংখ্যা প্রায় ৯,৫০০।

৭। সিমোঙ

কারকো ও টুটিঙ-এর মধ্যে সিয়াঙ নদীর উচ্চ অববাহিকায় নদীর বাঁ পাশে সিমোঙদের বাস। রীতি-নীতি-আচারে এরা প্রায় মিনইয়ঙ-দের মতো।

চিত্র-৫: আদি যোদ্ধা (১৯৪০খৃঃ)। চিত্রগ্রাহক- জন হাওয়ার্ড ফ্রাই উইলিয়ামস

৮। তাঙ্গাম

সিয়াঙ নদীর উচ্চ অববাহিকায় কুগিয়াঙ, নিয়েরেঙ ও মায়ুঙ নামের তিনটে গ্রামে তাঙ্গামদের বাস। তাদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪০০। একসময়ে প্রায় ২৫-টি গ্রাম জুড়ে ২০০০-এরও বেশি তাঙ্গামদের বাস ছিল, কিন্তু সিমোঙ-দের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধের কারণে তারা প্রায় মুছে যেতে বসেছিল। অবশিষ্টজনেদের বংশধররাই এখন ওই তিনটে গ্রামে বাস করে।

এছাড়াও ডোবাঙ, পাঙ্গি, পালিবো ইত্যাদি আরও কিছু উপগোষ্ঠী আছে আদি জনজাতিদের মধ্যে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে আদি জনজাতির বিভিন্ন উপগোষ্ঠী প্রধানত আলাদা আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলে তাদের বসবাস গড়ে তুলেছে। সিমোঙ ও তাঙ্গামদের উদাহরণ থেকে এও বোঝা যায় যে এই বসবাসের এলাকার দখল নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ, এমন কি বিধ্বংসী হানাহানিও হয়েছে। বসবাসের এলাকার সঙ্গে আদি জনগোষ্ঠীদের এই সম্পর্ক বোঝার জন্য আদিদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোককথার দিকে ফিরে তাকানো যাক।

লোককথাটি গামেঙ গ্রামের বোরি-দের কাছ থেকে ভেরিয়ার এলউইন সংগ্রহ করেছিলেন ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে এবং 'মিথস অফ দি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া' বইতে সংকলিত করেছিলেন (পৃঃ-১০৮)। লোককথাটি এইরকম:

পাঁচ ভাই ছিল। তাদের নাম ছিল ইয়াইয়িং, নিজো, ইয়েবু, নিতান ও নিগাঙ। এই পাঁচ ভাই গেলিঙ-এর ওপার থেকে টুটিঙ-এ আসে ও সেখানেই থিতু হয়ে বসবাস করবে বলে ঠিক করে। কিন্তু মেম্বা-রা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে ও তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। পাঁচ ভাই তখন ঘুরতে ঘুরতে জানবো বলে এক জায়গায় এসে পৌঁছয়। নিজো-র এই জায়গাটিকে খুব ভালো লাগে এবং সে বলে, "আমি এখানেই থাকব।" তাকে ওখানে রেখে বাকি চার ভাই আবার ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছয় কারকো-তে। তাদের চারজনেরই কারকোকে খুব ভালো লাগল এবং সেখানেই তারা ঘরবাড়ি বেঁধে থিতু হয়ে থাকতে লাগল।

কারকোয় থাকাকালীন তারা ডোগিনের উদ্দেশ্যে বলিদান দেবে বলে ঠিক করল। এই বলিদানে রীতি হলো দুটো পুরুষ মিঠুনকে (এক প্রজাতির বাইসন) একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে তারপর তাদের বলি দেওয়া। মিঠুনদুটো যখন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তখন একটা মিঠুনের পা মাটিতে গেঁথে গেল এবং সেইখান থেকে জলের ফোয়ারা বেরিয়ে এল। এর ফলে সবার মনে হলো যে সেইখানে নিশ্চয়ই কোনও বিপদজনক উইয়ু (Wiyu-আত্মা, শুভ বা দুষ্ট দুইই হতে পারে) বাস করে এবং সেই ভয়ে তারা সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেল। কেবল ইয়েবু সেখানে রয়ে গেল এবং তার থেকেই মিনইয়ঙ জনজাতি গড়ে উঠল।

বাকি তিন ভাই আবার ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছাল এক জায়গায় যার নাম ইউয়িঙ-কেবে-রন্নে। ইয়াইয়িং বলল, "আমার এই জায়গা ভালো লাগছে না, আমি চললাম।" কিন্তু নিতান এবং নিগাঙ-এর মনে হলো যে জায়গাটা কৃষিকাজের জন্য খুব ভালো আর তাই তারা সেখানেই থেকে গেল।

ইয়াইয়িং ও তার পরিবার আবার ঘুরতে ঘুরতে টুলুঙ বলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল এবং সেখানেই ঘর বাঁধল। কিন্তু কামকিঙ-এর গালোঙ-রা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সেখান থেকে হঠিয়ে দিল। বিতাড়িত হয়ে তারা নদী উপত্যকা ধরে আরও উপরদিকে যেতে যেতে গামেঙ-এ এসে পৌঁছাল এবং এখনও সেখানেই তারা থাকে।

গামেঙ-এ জনবসতি গড়ে তোলার পর তারা পায়ুম-এর মানুষজনের সঙ্গে যুক্তভাবে তাগিন-দের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাগিনদের এই অঞ্চলের বাইরে বার করে দেয়।

লোককথাটির মধ্যে লোকইতিহাসের বুনট খেয়াল করা যায়। অনুমান করা যায় যে আদি জনজাতিদের পূর্বপুরুষরা খুব সম্ভবত বহু বহু দিন আগে তিব্বতের দিক থেকে এসেছিল। আরও খেয়াল করা যায় যে আদি জনজাতি তাদের মধ্যের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীকে পাঁচ ভাইয়ের বংশধারা হিসাবে ভাবে, যারা খুব সম্ভবত তিব্বতের কোনও জায়গা থেকে এসে এই অঞ্চলে বসতস্থাপন করেছিল। আর প্রত্যেকটি জনজাতির পৃথক বসবাস-অঞ্চলকে দেখে সেই স্থান হিসাবে যেখানে তাদের বংশধারার আদিপুরুষরা প্রথম মনুষ্যবসতি স্থাপন করে। এর ফলে তাদের বসবাস-অঞ্চল তাদের কাছে কেবলমাত্র জল-জমি-জঙ্গল-শস্যক্ষেতের প্রাকৃতিক ভান্ডার নয়, তাদের কাছে তা তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি-কীর্তি ও মৃত্যু-পরবর্তী উপস্থিতির স্থান। তাই সেই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হলে বা সেই অঞ্চলের উপর দখল হারালে তাদের কেবল বস্তুগত ক্ষতি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করার অধিকার হারানোর ক্ষতি হয় না, আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক শিকড় উপড়ে যাওয়ার অপূরণীয় ক্ষতিও হয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতি-কীর্তি ও মৃত্যু-পরবর্তী উপস্থিতির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। এর ফলে প্রতিটি জনগোষ্ঠী মনে করে যে তাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে তাদের বসবাসের অঞ্চলের উপর তাদের দখল বজায় থাকার সঙ্গে। বসবাস অঞ্চলের উপর দখল রাখার জন্য তাই সর্বশক্তি জড়ো করে লড়তে প্রস্তুত।

বসবাস অঞ্চলের সীমানা নদী-জঙ্গল-পাহাড়ের প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে লোকশ্রুতিতে রক্ষিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা যদি একটা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন নতুন বাস্তুভিটের খোঁজ বা ঝুম (বন কেটে ও পুড়িয়ে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করা জমিতে চাষ)-এর নতুন জমির খোঁজ সেই সীমানায় টান ফেলে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ ও তা অসমাধিত থেকে গেলে সংঘাতের জন্ম দেয়। এছাড়াও অন্য কোনও জায়গা থেকে আসা কোনও জনগোষ্ঠী নতুন করে থিতু বাস তৈরির জন্য আগে থেকে বসত করা অন্য জনগোষ্ঠীর এলাকায় ঢুকলেও সংঘাত তৈরি হয়। এই সংঘাতের কাহিনীও লোককথাটির মধ্যে বোনা আছে।

আদি জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত লোকইতিহাস অনুযায়ী, সিয়াঙ-এর প্রায় প্রতিটি গ্রাম তাদের কোনও না কোনও গোষ্ঠীর বা কৌমের আদিপুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সেই আদিপুরুষরাই সেই সব জায়গায় জঙ্গল কেটে প্রথম মানুষের বসত বসিয়েছিল আর তাই সেই সেই জমি-জঙ্গলের আদি স্বত্ব তাদের। সেই আদিপুরুষদের কৌমের বংশধররাই উত্তরাধিকারসূত্রে সেই জমি-জঙ্গলের স্বত্বের অধিকারী। কোনও অন্য কৌমের মানুষ যদি পরে এসে সেই গ্রামে বা এলাকায় বসত স্থাপন করতে চায়, তবে তারা জমি-জঙ্গলের ব্যবহারের অধিকারী হতে পারে একমাত্র সেই আদি স্বত্বাধিকারী কৌমের অনুমতিক্রমে। বাস্তবে যখন আদি স্বত্বাধিকারী কৌম ভিন্ন অন্য কোনও কৌমের মানুষকে কোনও গ্রামের কেবাঙ সেই গ্রামে থাকার অনুমতি দেয়, তখন সেই পরিবারকে বলা হয় জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন কোনও বসতভিটে গড়ে নিতে, বা, বেশ কিছুদিন অব্যবহারে পড়ে থাকা পুরানো কোনও বসতভিটেয় নতুন করে বসত বাঁধতে, বা, আদি স্বত্বাধিকারী কৌমের কোনও পরিবারের দখলে ব্যবহার-অতিরিক্ত কোনও জমি থাকলে তা ধার নিতে। যেটাই হোক না কেন, এই অন্য কৌমের অধিবাসী ততদিন অবধিই এই দখলীস্বত্বের অধিকারী যতদিন অবধি সে নিজে সেখানে জীবিত অবস্থায় বাস করছে। সে মারা গেলে, তার বংশধররা সেই স্বত্ব

ভোগ করবে যদি গ্রামের কেবাঙ বিচার করে তার অনুমতি দেয়, তবেই। আর সে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলে তার দখলে থাকা ভিটে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

প্রতি বছর কোন্ কোন্ জমিতে ঝুম চাষ করা হবে তা গ্রামের কেবাঙ-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেবাঙ-এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ঘোষকরা রাতে ঘুরে ঘুরে সারা গ্রামে তা জানিয়ে দেয়। পরের দিন সেই নির্দিষ্ট জমিতে গোটা গ্রামের মানুষ সমবেত হয়ে চাষের প্রক্রিয়া শুরু করে। ঝুম চাষের প্রক্রিয়া গোটা গ্রামের মানুষের যৌথশ্রমের প্রক্রিয়া, তা কোনও ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী বা পরিবারের পৃথক উদ্যোগে হওয়া সম্ভব নয়।

আদি জনজাতির বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুম চাষের রীতি-নীতি, প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতায় কিছু কিছু ফারাক আছে, তবু সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি করার জন্য আদিদের সবচেয়ে বড় উপগোষ্ঠী মিনইয়ঙ-দের অনুসৃত ব্যবস্থাটা কীরকম দেখা যাক।

চিত্র-৬: ১৯৫০-এর দশকে ভেরিয়ার এলউইন-এর তোলা ছবি। ছবিটি একজন তাঙ্গাম পুরুষের। তার পিঠের বিশাল বেতের ঝুড়িটি মূলত ধান বওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঝুমচাষের জন্য ব্যবহৃত জমিকে বলে 'পাটাট' বা 'রিক্টাট'। এক একটি 'পাটাট' বা 'রিক্টাট' তিন বছর চাষ করার পর সেইটি বেশ কিছু বছরের জন্য অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, তার উপর বন-জঙ্গল গজিয়ে যায়, তারপর গ্রামের কেবাঙ-এর শামান ও গ্রামপ্রধানদের হিসাব অনুযায়ী চাষ-চক্রের সময় (তাদের ভাষায়, 'রিক্টাট পাসুপ') পূর্ণ হলে তবে আবার সেই রিক্টাট-এ জঙ্গল পরিষ্কার করে আবার চাষ করা হয়। কোনও রিক্টাট-এ প্রথম বছরের চাষকে বলে 'রিকপা' আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের চাষকে বলে 'রিগাঙ'। কোনও রিক্টাট-এ তৃতীয় বছরের চাষ, অর্থাৎ, দ্বিতীয় রিগাঙ চলার বছরই অন্য একটি রিক্টাট-এ প্রথম বছরের চাষ, অর্থাৎ রিকপা চালু করা হয়। এক-একটি গ্রামের এমন একাধিক রিক্টাট থাকে, যেমন বেগিঙ গ্রামের ছয়টি রিক্টাট আছে, রিউ গ্রামের আছে দশটি। বাইরে থেকে কোনও সার ব্যবহার করা হয় না, প্রাকৃতিক উপায়েই কর্ষিত জমির উর্বরতা আবার ফিরে আসতে দেওয়ার জন্য এই চাষ-চক্রের পদ্ধতি।

আগেকার দিনে, গ্রামের প্রতিটি মানুষের মুখস্থ থাকত গ্রামের কোন রিক্টাট চাষ-চক্রের কোন্ অবস্থায় আছে। রিক্টাট পাসুপের সময়কাল মানুষের বয়স হিসাবের একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। একটি রিক্টাট পাসুপ পার করেছে যে মানুষ, তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে ধরা হতো, তিনটে রিক্টাট পাসুপ পার করলে বৃদ্ধাবস্থা, আর খুব কম মানুষই পাঁচটা রিক্টাট পাসুপ পার করতে পারত। এখনও গ্রামের বয়স্কজনেরা বয়সের হিসাব এইভাবেই রাখে।

রিক্টাট পাসুপ-এর সময়কাল অবশ্য সব গ্রামে একইরকম নয়। জমির উর্বরতা, গ্রামের জনসংখ্যার চাপ, হাতে থাকা রিক্টাটের সংখ্যা— এই সবের উপর নির্ভর করে রিক্টাট পাসুপ-এর দৈর্ঘ্য বদলে যায়। রিউ গ্রামে যেমন এখন রিক্টাট পাসুপের দৈর্ঘ্য ২১ বছর, কোমসিঙ গ্রামে ২৫ বছর, আবার বেগিঙ গ্রামে ১৩ বছর।

প্রকৃতির চক্রের তালে বাঁধা মিনইয়ঙদের জীবনধারার একটা চিত্র এইভাবে তুলে ধরা যায়:

ঋতু	আদিদের পঞ্জিকা	কৃষিকাজ
ডঙগুপ	জিনমুর (জানুয়ারি)	জোয়ার ফসলের শস্যসংগ্রহের কাজ শেষ করা, পুঁতি হিসাবে ব্যবহৃত ঘাসের বিচি সংগ্রহ শেষ করা, ঘর তৈরি বা সারাইয়ের রসদ সংগ্রহ।
	কোমবোঙ (ফেব্রুয়ারি)	ধানচাষের প্রস্তুতি।
	গালিঙ (মার্চ)	পরবর্তী পাটাট তৈরির কাজ, ঘর তৈরি ও সারাই শেষ করা, 'উনয়িঙ' ও 'মোনপু' উৎসব পালন।
লোবো	লুকিঙ (এপ্রিল)	রিকপা-র কাজ।
	লোবো (মে)	দ্বিতীয় বছর রিগাঙ হয়ে যাওয়া জমিকে অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার জন্য তৈরি করা, ধান বোনা, বেড়া দেওয়া।
	য়িলো (জুন)	পুঁতি হিসাবে ব্যবহৃত বিচি দেয় যে ঘাস, তা বোনা, জোয়ার বোনা, 'ইটর' উৎসব পালন।
গাদি	টান্নো (জুলাই)	জমির আগাছা সাফ, ফসল পরিচর্যা, 'সোলুঙ' উৎসব পালন, ভুট্টা ফসল সংগ্রহ।
	য়িও (অগস্ট)	দ্বিতীয়বার জমির আগাছা সাফ।
	য়িতে (সেপ্টেম্বর)	জোয়ার ফসল সংগ্রহ, শাকসবজির জন্য ঝুম চাষ।
ডিগিন	আও (অক্টোবর)	ধানের ফসল সংগ্রহ শুরু, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ।
	আনে (নভেম্বর)	ধানের ফসল সংগ্রহ শেষ করা।
	বেসটিঙ (ডিসেম্বর)	জোয়ার ফসলের শস্যসংগ্রহের কাজ শুরু করা, পুঁতি হিসাবে ব্যবহৃত ঘাসের বিচি সংগ্রহ শুরু করা।

ঝুম চাষের ফসলের পাশাপাশি জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা খাদ্য, শিকার, গৃহপালিত মিঠুনের মাংস— এইসবের মধ্য দিয়ে আদিরা খাদ্যে প্রায় স্বনির্ভর। কেবল নুনের জন্য তাদের পরের উপর নির্ভর করতে হয়েছে প্রথম থেকেই, আর তার মধ্য দিয়েই বুঝি আদিদের সঙ্গে অন্যদের আদান-প্রদান বাণিজ্যের শুরু। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাদের লোককথা থেকেই। আদিদের মধ্যের বোরি উপগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকে ভেরিয়ার এলউইন-এর সংগ্রহ করা এমন দুটি লোককথা দেখা যাক।

প্রথম লোককথা

অনেক দিন আগের কথা। দুই ভাই টানি ও টারো-র মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছিল। টারো তার ফলে গ্রাম ছেড়ে মিমেট (তিব্বত)-এর দিকে পাড়ি দিল। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের উপর ঘুরতে ঘুরতে, বিশাল বিশাল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একদিন তার এক সাদা চামড়ার মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। সেই মেয়ের মাথার লম্বা চুল প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, তার নাক বিশাল বড় আর দাঁতগুলো বড় বড় আর ধারালো। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও টারো তাকে বিয়ে করল। তার গর্ভে টারোর সন্তানও হলো। তারপর একদিন টারোর বউ মারা গেল। টারো তার মৃতদেহ জঙ্গলের মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানেই তাকে কবর দিল।

এইদিকে, টারো চলে যাওয়ার পর টানি তার ভাইয়ের অভাব বোধ করতে লাগল। একদিন সে ঠিক করল যে সে টারোকে খুঁজতে বেরোবে। সে বেরিয়েও পড়ল এবং তিব্বতের পথ ধরল। যেতে যেতে সে এসে পৌঁছাল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে টারো তার বউকে কবর দিয়েছে। তার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল কিন্তু চারিদিকে কোথাও জল ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে সে সেই কবরে এসে সেখানে এক ছোট ফোয়ারা দেখতে পেল। সেই ফোয়ারার জলই সে আঁজলা ভরে খেল। কেমন অদ্ভুত স্বাদ সেই জলের। সে দেখল যে সেই ফোয়ারার দুইদিকে সাদা কিছু গুঁড়ো ঢিপি হয়ে আছে। সে তার স্বাদ নিল, সেই নোনতা স্বাদ তার বেশ ভাল লাগল। সে বোঝা ভর্তি করে সেই সাদা গুঁড়ো নিয়ে ফিরে এল ঘরে, তার ভাইয়ের কথা ভুলে গিয়ে। টারোর বংশধররা এখনও তিব্বতে থাকে, তাই তিব্বতের মানুষদের কাছে নুন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় লোককথা

বহু দিন আগে বোরিরা নুন পেত না। বর্ষাকালে যখন সিকে নদীতে বান ডাকত, তখন সেই বানের জলে উপর থেকে কাঠের কাটা টুকরো ভেসে আসত। নিশ্চয়ই কোনও মানুষ এই কাঠ কেটেছে! তাই বোরিরা নিশ্চিত হলো যে উপরদিকে উত্তরে নিশ্চয়ই মানুষের বাস আছে। সেই মানুষদের খোঁজে কিছু বোরি নদীর উজান বেয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে উত্তরদিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে তারা মিমেট (তিব্বত)-এ পৌঁছাল। এখন যেমন মিঠুনকে অল্প নুন খাওয়ানো হয়, মিমেটের লোকেরা তেমন প্রথমে বোরিদের অল্প নুন দিল স্বাদ নেওয়ার জন্য। তারপর তারা দেখাল তাদের তৈরি পশম-তন্তু, নৌকা আর জামা। কিছু নুন তারা নিয়ে আসার জন্যও দিল। সেই বোরিরা যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন গ্রামের সবাই অবিবাহিত পুরুষদের যৌথঘরে সমবেত হলো। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই তাদের আনা নুন খেয়ে দেখল। সবারই খুব ভাল লাগল। আরও নুন পেতে হবে বলে তারা ঠিক করল। সুতরাং তারা বাঁশের কঞ্চি, লতাপাতা সংগ্রহ করে মিমেট-এ নিয়ে গেল ও তার বিনিময়ে নুন সংগ্রহ করল। পরের বার মিমেট-এ যাওয়ার সময় তারা পশুর চামড়াও নিয়ে গেল এবং তার বিনিময়ে পশমের লম্বা জামাও নিয়ে এল।পরে তারা মিমেট-এ যাওয়ার সময় আরও পশুর চামড়া ও ধানও নিয়ে যেত। তখন তিন বোঝা ধানের বিনিময়ে এক বোঝা নুন পাওয়া যেত।

মিমেট থেকে পাওয়া বস্তু নিয়ে বোরিরা রিগা এবং কেরাঙ গ্রামের মিনইয়ঙদের কাছেও যেত। মিনইয়ঙরা নুন পেতে এতই আগ্রহী ছিল যে এক সময়ে তারা নুনের বিনিময়ে মিঠুনও দিত বোরিদের।

একবার গাসেঙ ও পায়ুঙ-এর লোকেরা যখন বিপুল পরিমাণ বস্তু নিয়ে মিমেট-এ গেল বিনিময়ের জন্য, তখন মিমেটের মানুষরা তাদের দুইজনকে হত্যা করে সব বস্তু চুরি করে নিল। বোরি যোদ্ধারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জোট বেঁধে মিমেট গেল। মিমেট-এর লোকেরা তখন তাদের কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল আর বলল যে ঝগড়া টিকিয়ে না রেখে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিনিময়ের হারও আরও ভাল করতে তারা রাজি হল। তারা বলল যে দুই বোঝা ধানের বিনিময়েই তারা একবোঝা নুন দেবে। বিনিময়ের এই হারই এখনও চলছে। পরে বোরিরা শুনতে পেল যে পাসিঘাট-এও নুন পাওয়া যায়। শুনে তারা নুন আনতে পাসিঘাটেও যেতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম দিকে সমতল থেকে পাওয়া নুনের স্বাদ তাদের ভাল লাগত না, মিমেট থেকে পাওয়া নুনের স্বাদই সবচেয়ে ভাল বলে এখনও তারা মনে করে। ধীরে ধীরে অবশ্য পাসিঘাট থেকে পাওয়া নুনের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল আর আজ বোরিরা তাদের নুনের বেশিরভাগ পায় কখনও আলোঙ, কখনও মিনইয়ঙ মধ্যবর্তীদের কাছ থেকে।

এই দুটো লোককথা থেকে আমরা কী ধারণা তৈরি করতে পারি দেখা যাক। বোরিদের পরম্পরাগত বাসস্থান সিয়াঙ জেলার উত্তর প্রান্ত বরাবর। এই উত্তর প্রান্ত তিব্বত (তাদের ভাষায় মিমেট) সংলগ্ন। ফলে আদি জনজাতিদের মধ্যে বোরিদের সঙ্গেই সম্ভবত তিব্বতীদের আদানপ্রদান প্রথম নিয়মিত চেহারা নেয়। তিব্বতীদের কাছ থেকেই তারা প্রথম নুন পায় ও নুনের ব্যবহার শেখে। প্রথম লোককথাটিতে দেখা যাচ্ছে যে বোরিরা নুনের সঙ্গে তাদের এক সুদূর পূর্বপুরুষ টারো-র সম্প্রদায়-বহির্ভূত বউয়ের কবরস্থ দেহাশ্মের সম্পর্ক তৈরি করেছে। কৌতুহল জাগে যে এই সম্পর্ক তৈরির কারণ কী ? নেহাতই

তিব্বতীদের একটি বস্তু না হয়ে নুনকে নিজেদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কোনও এক ভাবে সম্বন্ধিত হতে হবে কেন ? যে কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার পূর্বপুরুষদের দ্বারা স্থাপিত ও তৎপরবর্তীতে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বলে মনে করে বলেই কি অপরের কাছ থেকে পাওয়া নুনের ক্ষেত্রেও এমন এক লোককথার গঠন হল ? আরো কৌতুহল জাগে যে টারোর বউয়ের চুল-নাক-দাঁত অমন অস্বাভাবিক হতে হল কেন ? নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে বিয়েকে অস্বাভাবিক হিসাবে দেখানোর জন্যেই কি ? দ্বিতীয় লোককথাটি থেকে ইতিহাসের কথা তুলনায় অনেক প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় বলে মনে হয়। কীভাবে তিব্বতিদের সঙ্গে প্রথম বিনিময় হল, কী কী বিনিময় করা হতো, বিনিময়ের হারই বা কেমন ছিল, তিব্বতিদের কাছ থেকে আনা নুন কীভাবে অন্য আদি জনগোষ্ঠীদের সঙ্গেও বিনিময়ের বস্তু হয়ে উঠল— এইসবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটা আদল পাওয়া যায় বলেই মনে হয়। পাসিঘাট-এর প্রসঙ্গটি খেয়াল করার মতো। পাসিঘাট হলো সিয়াঙ দক্ষিণ-পূর্বে আসাম-সংলগ্ন একটি জায়গা, এখানে তাই বিনিময় অসমিয়াদের সঙ্গে হতো। ফলে বোঝা যায় যে তিব্বতিদের সঙ্গে বিনিময়ের বহু বছর পরে সিয়াঙ জেলার দক্ষিণের বাসিন্দাদের সঙ্গে অসমিয়াদের বিনিময় শুরু হয়, এবং তাও ওই নুনকে কেন্দ্র করে। দক্ষিণে অসমিয়াদের সঙ্গে এই বিনিময়ে বোরিরা মূল ভূমিকা নিত না, নিত মিনইয়ঙরা (সম্ভবত পদমরাও), যারা সিয়াঙ-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকত। মিনইয়ঙদের কাছ থেকেই বোরিরা বা উত্তরের অন্য বাসিন্দারা আবার বিনিময়েরমাধ্যমে আসামের নুন বা অন্য বস্তু পেত। ক্রমশ উত্তর সীমান্তে বিনিময়ের তুলনায় দক্ষিণ সীমান্তে বিনিময়ের গুরুত্ব বাড়তে

চিত্র-৭: ১৯৫৬-য় ভেরিয়ার এলউইন-এর তোলা ছবি। ছবির বিবরণে এলউইন লিখেছিলেন: "পাগুম-এ আমাদের অবস্থানকালে সেখানে আসা এক পালিবো, যার আসার উদ্দেশ্য পশম-তন্তু ও গয়নার বিনিময়ে ধান সংগ্রহ করা।"

থাকে। এইভাবে আমরা ধারণা করতে পারি যে নুনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিব্বতি ও পরে অসমিয়াদের সঙ্গে যেমন আদিদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও পরস্পর-নির্ভরতাও গড়ে উঠেছিল।

তাই আদি জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যেমন স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র ছিল, তেমনই পরস্পর-সম্পর্ক ও আদানপ্রদানও ছিল। তার ছাপ পড়েছে তাদের ভাষাতেও। আদি জনগোষ্ঠীদের মাতৃভাষাগুলোকে একটি আদি ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত হিসাবে ধরা যায়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনই সাযুজ্য ও পরস্পর-বোধ্যতাও আছে। এমন পাঁচটি ভাষা আমরা এখানে বিবেচনা করব। ভাষাগুলি হল: বোকার, বোরি, কারকো, মিলাঙ ও তাঙ্গাম।

প্রথমে দেখা যাক ভাষাগুলোয় সর্বনাম ব্যবহার।

ভাষার নাম	সর্বনাম					
	আমি	তুমি	সে	আমরা	তোমরা	তারা
বোকার	গোঁ	লানয়ি	লাকুম	গোঁনয়ি (২জন) গোঁলু (২-এর বেশি)	মানয়ি (২জন) মালু (২-এর বেশি)	মেনয়ি (২জন) মালু (২-এর বেশি)
বোরি	গোঁ	নো	বি	গোঁলু	নোলু	বুলু
কারকো	গোঁ	নো	বিই	গোঁনয়ি (২জন) গোঁলু (২-এর বেশি)	নোনয়ি (২জন) নোলু (২-এর বেশি)	বিনয়ি (২জন) বুলু (২-এর বেশি)
মিলাঙ	গাঁ	গিঁ	জি	গাঁজি	ন্যা	জাজি
তাঙ্গাম	গোঁ	নো	নোডি	গোঁরু	নোরু	ডাটাঙ-মেরু

খেয়াল করা যায় যে 'আমি' সর্বনাম প্রায় সবক্ষেত্রেই একরকম, অন্যগুলোর ক্ষেত্রে পার্থক্য চলে আসছে। বহুবচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো যে কিছু ভাষায় ২ জন ও ২-এর বেশি জন বোঝাতে আলাদা শব্দ ব্যবহারের চল আছে। এবার দেখা যাক গণনার ক্ষেত্রে রীতি কী রকম।

সংখ্যা	ভাষার নাম				
	বোকার	বোরি	কারকো	মিলাঙ	তাঙ্গাম
এক	আকেন	আকোন	আতের	আকান	য়োকোন
দুই	আনয়ি	আনয়ি	আনয়ি	নে	য়োঙ্গি
তিন	অউম	আওন	আরুম	হাম	য়োদেন
চার	আপ্পি	আপ্পি	আপ্পি	পে	য়োপি
পাঁচ	ওঙ্গো	এঙ্গো	পির্নগো	পাঙ্গু	য়োঙ্গো
ছয়	আক্কি	আক্কে	পির্কয়াঙ	সাপ	য়োঙ্গকুঙ
সাত	কিনি	কিনিট	কিনিট	রাঙ্গাল	কেনে
আট	পিনয়ি	পিনয়ি	পিনয়ি	রায়েঙ	পিনয়ি
নয়	নোনোঙ	কোনাঙ	কোনাঙ	কান্যেম	কোনাঙ
দশ	ঈয়িঙ	ঈয়িঙ	ঈয়িঙ	হাঙটাক	আইঙ
এগার	ঈয়িঙ গোলা আকেন	আকোন কু	ঈয়িঙ কোলাঙ আতের	হাঙটাক কালো আকান	আইঙ্গেটলা য়োকোন

দশ এবং এক-কে ব্যবহার করে যেভাবে এগার করা হয়েছে, সেভাবেই বারো এবং তার পরের সংখ্যার গুনতি চলে উনিশ

অবধি, তারপর কুড়ি-র জন্য একটি শব্দ, তারপর কুড়ি এবং এক, কুড়ি এবং দুই করে গুনতি চলতে থাকে। দেখা যায় যে গুনতির এই রীতিতে সব ভাষার মধ্যেই সাযুজ্য আছে, কিছু কিছু সংখ্যার নামও একইরকম, কিন্তু আবার ভাষায় ভাষায় ভেদও আছে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যেই গণনার মৌলিক কাঠামোটি স্বকীয় চেহারায় হাজির।

এই ভাষাগুলোর আরও কিছু বৈশিষ্ট খেয়াল করা যেতে পারে। যেমন, তাঙ্গাম ভাষায়, বিশেষ্য অনুযায়ী বিশেষণের রূপ পাল্টে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কালো কুকুর হলো আকে কেকা, কালো গরু হলো রুনে রুকা, কালো পোষাক হলো চিমান-নে আগিয়া। এখানে, আকে মানে কুকুর, রুনে মানে গরু, আগিয়া মানে পোষাক। দেখা যাচ্ছে কালো বিশেষণটি কুকুরের ক্ষেত্রে কেকা, গরুর ক্ষেত্রে রুকা আর পোষাকের ক্ষেত্রে চিমান-নে। বিশেষণের রূপ কেবল পাল্টে যাচ্ছে না, বিশেষ্যর সাপেক্ষে তার অবস্থানও পাল্টে যাচ্ছে— যেমন, কুকুর ও গরুর ক্ষেত্রে তা বিশেষ্যর পরে বসছে, আর পোষাক-এর ক্ষেত্রে তা বিশেষ্যর আগে বসছে।

বিশেষণ ব্যবহারের আর একটি বিশেষত্বের উদাহরণ দেওয়া যায় বোরি ভাষা থেকে, যেখানে বিশেষ্য বস্তুটির আকৃতির উপর নির্ভর করে বিশেষণ বদলে যায়, যেমন, একটি দড়ি বোঝাতে সোকি আয়োঙ, আর একটি থালা বোঝাতে তালি বোরকেন। অর্থাৎ, লম্বা আকৃতির বস্তু হলে একটি বোঝাতে আয়োঙ ব্যবহৃত হয়, চ্যাপ্টা-গোল আকারের বস্তু হলে একটি বোঝাতে বোরকেন ব্যবহৃত হয়।

বোরি ভাষায় বাঁশ-এর জন্য অনেকগুলো শব্দ আছে, যেমন— ডিবাঙ, হেগু, হেপ, হেসো। এরা কিন্তু সমার্থক নয়, এরা বিভিন্ন ধরনের বাঁশের আলাদা আলাদা নাম। আমরা হয়তো সেইসব বাঁশের মধ্যে কোনও পার্থক্য করতে পারব না, কিন্তু বোরিদের মধ্যে পরম্পরাগতভাবেই গুণাবলী অনুযায়ী এইভাবে বাঁশের মধ্যে পার্থক্য করা ও সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে তাদের কাজে লাগানোর জ্ঞান আছে।

মিলাঙদের মধ্যে আবার মিলাঙ ভাষা ছাড়াও একটি সাংকেতিক ভাষার চল আছে, যা গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রয়োজন হলে কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই ব্যবহার করে।

লিঙ্গ পার্থক্য বোঝাতে এইসব ভাষাতে দুইরকম রীতিই আছে— পৃথক লিঙ্গের জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহার করা, অথবা মূল বিশেষ্যর সঙ্গে উপসর্গ বা অনুসর্গ জুড়ে লিঙ্গ বোঝানো। প্রতিটি ভাষাতেই মূলত কর্তা– কর্মপদ– ক্রিয়াপদ এই বিন্যাসে বাক্য গঠন করা হয়।

আদি ভাষাগোষ্ঠীর এই ভাষাগুলি লিপিহীন বা লিখনরীতিহীন কথ্যভাষা। গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে বয়স্কজনেদের স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়ে আছে কাহিনী, ইতিকথা, রূপকথা, ছড়া, গান, প্রবাদ-প্রবচনের বিপুল ভান্ডার। আভাঙ হলো আদিদের পৌরাণিক কাহিনী। এই অঞ্চলের ইতিহাসের আকরিক রূপ এই আভাঙগুলোই।

এতক্ষণ অবধি আমরা দেখলাম যে আদি জনজাতির মানুষরা স্বকীয় সমাজ-সংগঠনের আধারে স্বাধীন জীবনাচরণের একটা পরম্পরা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু যে ছবি চারটি থেকে আমরা আদিদের সঙ্গে পরিচয় শুরু করেছিলাম, তার তৃতীয় ও চতুর্থ ছবিটি যে ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে তা কী ভাবে ঘটল তা আমরা এখনও আলোচনা করি নি। কোন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ইংরেজদের 'আবোর এক্সপিডিশন'-এ আদিদের গ্রাম পুড়ে ছাই হলো, দলে দলে আদিদের বন্দী হতে হলো ইংরেজদের বন্দীশিবিরে, আর তারপর কী হলো, এখন সেই আলোচনায় আসা যাক।

১৮২০-র দশক থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা আসামের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে। ক্রমশ আদিবাসী এলাকার জমি দখল করে চা-বাগান বসানোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ প্রশাসন। তখনই সংঘর্ষকে বড় রূপ দিতে না চাওয়া ব্রিটিশ প্রশাসন ১৮৭০-এর দশকে আদিবাসীদের এলাকা ও ব্রিটিশ-প্রশাসনাধীন এলাকা ভাগ করে একটি 'ইনার লাইন' ঘোষণা করে। বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ মূলত ছিল এই ইনার লাইন দিয়ে চিহ্নিত আদিবাসীদের এলাকার মধ্যে। কিন্তু অচিরেই ইংরেজ প্রশাসন চেষ্টা করতে থাকে আদিবাসীদের এলাকার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাতে ও সেই অঞ্চল দিয়ে চিন অবধি কোনও বাণিজ্যপথ তৈরি করা যায় কি না তার চেষ্টা করতে। ব্রিটিশ প্রশাসনের এই চেষ্টার একজন প্রধান হোতা ছিলেন নোয়েল উইলিয়ামসন, যিনি ১৯০৫ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকাল অফিসার হয়ে আসামে এসেছিলেন। তার পর থেকে এই উইলিয়ামসন সাহেব লোক-লস্কর নিয়ে একের পর এক 'অভিযান' চালাতে শুরু করেন ইনার লাইনের ওপারে আদিবাসীদের এলাকার মধ্যে। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বহু যুগ ধরে চলে আসা তিব্বতীদের সঙ্গে আদিবাসীদের বিনিময়কে বন্ধ করে তার জায়গায় ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে আসতে আদিবাসীদের বাধ্য করা। এছাড়াও ব্রিটিশদের বশংবদ একটা অংশ তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করার বাসনাও ছিল। উইলিয়ামসন সাহেবের অস্ত্র ছিল দুইরকমের— ভোগের বস্তু, বিশেষ করে আফিমের মতো নেশাদ্রব্য দেদার বিলিয়ে আদিবাসীদের একটা অংশের মধ্যে লোভ-লালসা জাগিয়ে তুলে আদিবাসী সমাজের পরম্পরাগত অনুশাসনের থেকে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা ও তাদের ব্রিটিশ-অনুগামী করে তোলা, আর অন্য অস্ত্র ছিল হুমকি-হামলা ও পাশবিক শক্তি-প্রদর্শনের অস্ত্র। সিয়াঙ, সুবানসিরি, লোহিত নদীর অববাহিকা ধরে তিনি তাঁর লোকলস্করের পল্টন নিয়ে মিশমি ও নাগাদের বসবাসের গ্রামগুলোয় বেশ কয়েকবার হানা দিয়েছিলেন। যেখানে ভোগের বস্তু ও আফিম বিলিয়ে আনুগত্য তৈরি করতে পারেন নি সেখানে আদিবাসীদের একাধিক গ্রাম আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বহু গ্রামে আদিবাসীদের পালিত পশুদের ধরে এনে মেরে লাশের স্তূপ বানিয়েছিলেন আদিবাসীদের আনুগত্যের শিক্ষা দিতে। ১৯১১ সালে আবার তিনি উত্তর সিয়াঙ-এ এসে হাজির হন দলবল সমেত। এর দুই বছর আগে, ১৯০৯ সালে এই এলাকায় এসে উইলিয়ামসন খুব সুবিধা করতে পারেন নি। কেবাঙ গ্রামে পৌঁছানোর পর তাঁকে

ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ সেই গ্রামের গ্রামপরিষদ সভা করে তাঁকে জানায় যে আদি গোষ্ঠীদের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন, তাই ফিরে না গেলে তিনি বিপদে পড়বেন। ১৯১১ সালে উইলিয়ামসন তাই বেশ তৈরি হয়েই এসেছিলেন বড় দলবল নিয়ে। কিন্তু এইবার কেবাঙ অবধি পৌঁছানোর আগেই আদিরা তাঁকে আটকে দিল। কেবাঙ তখনও এক দিনের রাস্তা, উইলিয়ামসনের তাঁবু থেকে খাদ্যসামগ্রী ও রসদ চুরি হয়ে যায়। ক্ষিপ্ত উইলিয়ামসন নিকটবর্তী আদিদের গ্রাম কেবাঙ ও রোটাঙ-এর উপর বদলা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে উইলিয়ামসনের মালবাহকদের কাছ থেকে গ্রামবাসীরা জানতে পারে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই আদি যোদ্ধারা হানা দেয় উইলিয়ামসনের দলের উপর। উইলিয়ামসন, আর এক ব্রিটিশ আধিকারিক গ্রেগরসন ও তাঁদের ৪৫ জন মালবাহককে তারা মেরে ফেলে।

এর জবাব হিসাবেই ব্রিটিশ প্রশাসন আবোর এক্সপিডিশন-এর পরিকল্পনা করে। ব্রিটিশ সেনার মধ্যে নৃশংসতার জন্য বিখ্যাত গুরখা রাইফেলস-এর পল্টনকে পাঠিয়ে নৃশংস হানাদারি চালিয়ে কেবাঙ গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ও বিস্তীর্ণ এলাকায় হামলা চালিয়ে বহু আদি মানুষজনকে বন্দী করে এনে পশুর মতো বন্দী করে রাখা হয় রিগা-র বন্দীশিবিরে।

এই হামলা থেকে বাঁচতে একাধিক আদিদের গ্রামের গ্রামপ্রধান এসে ব্রিটিশ সেনা-অফিসারদের কাছে তাদের গ্রামের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর মধ্য দিয়েই ব্রিটিশরা প্রথম আদি জনজাতির এলাকায় তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের শিকড় প্রোথিত করে। এর পর পরই ইনার লাইনের এদিকে আদিবাসী অঞ্চলের মধ্যে পাসিঘাট ও আলোঙ-এ ব্রিটিশ প্রশাসনিক দফতর স্থাপন করা হয়, ব্রিটিশ প্রশাসক ও সেনা মোতায়েন করা হয় এবং ব্রিটিশ-কর্তৃত্বাধীন বাণিজ্যশৃঙ্খলে আদিবাসীদের বাঁধার প্রক্রিয়া নির্ধারক চেহারা গ্রহণ করে।

চিত্র-৮ (২০০৫)

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণকে ব্রিটিশ প্রশাসক ও তার অনুগামীরা হাজির করেছে বন্য অসভ্য আবোরদের অরাজকতা শেষ করে সভ্যতার প্রথম পা ফেলা হিসাবে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি উইলিয়ামসনকে উপস্থিত করে লোকপ্রিয় এক প্রশাসক হিসাবে, বর্বর আবোরা যাকে খুন করেছিল। উল্টোদিকে, আদি মানুষরা এখনও এই ঘটনাকে মনে রেখেছে ব্রিটিশ হামলার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার গৌরবময় লড়াই হিসাবে। উইলিয়ামসনদের মারার জন্য যাদের প্রাণদন্ড হয়েছিল, আদিদের লোকস্মৃতিতে তাঁরা আজও জাতীয় বীর হিসাবে বেঁচে আছেন। চিত্র ৯ এর নিদর্শন। ছবিটি ২০০৫ সালে সরিৎ কুমার চৌধুরী তুলেছেন আদিদের গ্রাম ইয়াগরুন-এ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাতমুর জামোহ্-কে, যিনি মানমুর জামোহ্-র নাতি। এই মানমুর জামোহ্-কে ১৯১১ সালে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল উইলিয়ামসনকে হত্যার শাস্তি হিসাবে। মাতমুর গর্বের সঙ্গে তাঁর দাদুর সেই অস্ত্রকে সগর্বে প্রদর্শন করছেন যা দিয়ে ১৯১১ সালে উইলিয়ামসন-হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এই অস্ত্রটি আজ আদিদের একটি ঐতহিাসিক স্মারকে পরিণত হয়েছে।

১৯১১ সালে আদি অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য সূচিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন অবধি আদিদের প্রতিরোধের চেষ্টা, এমনকি সশস্ত্র সংঘাত অবধি, বজায় থেকেছে। ১৯৪৭-এর পর 'স্বাধীন' ভারত সরকার এই অঞ্চলকে নেফা (নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি)-র অন্তর্গত করে ও ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রশাসনিক সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে ভেরিয়ার এলউইন এমন বেশ কিছু ভাবনা ও দিকনির্দেশ হাজির করেছিলেন যার মধ্যে আদিবাসী জনজাতিদের পরম্পরাগত সমাজরূপ ও জীবনশৈলীকে সম্মান জানিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরির অভিপ্রায় ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকে ভারত-চীন যুদ্ধের পরে সেই সবই পরিত্যক্ত হয়। চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর ভারতের দক্ষিণ-পূর্বের এই সীমান্ত-অঞ্চলে নিশ্ছিদ্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ভারতজুড়ে ফেনিয়ে ওঠা জাতীয়-সমসত্বতাবাদী জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে যায় 'নেফা-র জন্য দর্শন'-এর জনজাতিদের স্বাধীন বিকাশের পরিসর তৈরির চিন্তা। দিল্লীর সংসদে সাংসদরা তখন হল্লা করে দাবি তুলেছিল ৫০ হাজার পাঞ্জাবি কৃষককে অরুণাচল প্রদেশে (নেফা-য়) নিয়ে গিয়ে জমি-বাড়ি-সরকারি সাহায্য দিয়ে সেখানে স্থিতু করিয়ে দেওয়ার। এর মধ্য দিয়ে নাকি সেখানকার জনতার 'দেশপ্রেমের ঘাটতি' পূরণ করা যাবে, আবার 'অলস' জনজাতিদের পরিবর্তে এই কর্মঠ মানুষরা দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকেও নিশ্চিত করবে! শেষপর্যন্ত এই মানুষের গণ-প্রতিস্থাপন বাস্তবায়িত না হলেও, এরপর থেকে প্রশ্নাতীত হয়ে যায় অরুণাচল প্রদেশে দ্রুত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সর্বাত্মক করে তোলার নীতি। সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে দিতে দ্রুত সড়কপথ তৈরি, পুঁজি-পণ্য-বাণিজ্যের বন্ধনে স্থানীয় একটা অংশকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধা— এর মধ্য দিয়ে জনজাতির মানুষদের

'মূলধারায়' টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসাই অবিসংবাদী লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলমান।

আদি জনজাতির উপর এর প্রভাব কী পড়ল দেখা যাক। আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে কোনও আদি জনজাতিগোষ্ঠীর লোকজীবনের কেন্দ্রে অবস্থিত আছে কেবাঙ, যে কেবাঙ হলো তাদের স্বায়ত্তশাসনের গণ-রাজনৈতিক পরিসর। এই কেন্দ্রটির ক্ষয় তাদের পরম্পরাগত যৌথজীবনের ক্ষয়কে যেমন ত্বরান্বিত করবে, তেমনই আবার তা প্রতিফলিতও করবে। তাই নজর দেওয়া যাক এই কেন্দ্রটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার দিকে।

পরম্পরাগতভাবে আদিদের গ্রামের কেবাঙে গুরুত্ব পেতেন শামান ও বয়স্কজনেরা কারণ তাঁরাই লোকশ্রুতি-বাহিত পরম্পরাগত জ্ঞানের ভান্ডারী হিসাবে কাজ করতেন। এই প্রথার কিছুটা বদল ঘটে ব্রিটিশ আধিপত্যের আমলে। কীভাবে এই বদল ঘটল দেখা যাক। ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্যকে চিহ্নিত করতে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি কৌমের একজনকে 'সরকারি গম' (আদি ভাষায় গম মানে গ্রামপ্রধান) হিসাবে নিয়োগ করতে থাকে। এই সরকারি গম-রা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনও মাইনে পেত না, পেত কেবল একটি লাল কোট। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে জনজাতির মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এই সরকারি গমদের গুরুত্ব গ্রামের কেবাঙ-এ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বলা বাহুল্য যে এই সরকারি গমদের নির্বাচনে পরম্পরাগত লোকজ্ঞানের উপর তার দখল বিবেচিত হতো না, বিবেচিত হতো কেবল ব্রিটিশদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা। আর এই সরকারি গমদের মধ্য ব্রিটিশ সরকারও দরকার মতো গ্রামের কেবাঙ-এর সভায় তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব হাজির করার সুযোগ করে নেয়। ফলে একদিক থেকে কেবাঙ-এ পরম্পরাগত লোকজ্ঞানের ভান্ডারী শামান ও বয়স্কদের গুরুত্ব যেমন কমতে থাকে, অন্যদিকে তেমন কেবাঙ-এর স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রটিও কিছুটা খর্বিত হয়।

এরপর ব্রিটিশরা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরও বাড়াতে 'বাঙ্গো' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তার অনুগত সরকারি গমদের দিয়ে। এই বাঙ্গো অনেকগুলো গ্রামের মিলিত পরিষদ। সেখানে গ্রামগুলোর সরকারি গম-দের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, অন্য আর কেউ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। সরকারি গমদের মধ্যে একজনকে 'সেক্রেটারি' করা হবে (পদের ইংরেজি নামই বলে দেয় যে কাঠামোটি ব্রিটিশদের মস্তিষ্কপ্রসুত) এবং তার ব্যবস্থাপনায় একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত 'ফান্ড' চলানো হবে। অনেকগুলি গ্রামের বিষয় ও তাদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ এই বাঙ্গো-র বিষয় বলে চিহ্নিত করা হলেও এর মধ্য দিয়ে আসলে কেবাঙ-এর উপরে এমন একটি সিদ্ধান্তগ্রহণের পরিসর তৈরি করা হলো, যেখানে সব গ্রামের সব মানুষ কখনওই অংশ নিতে পারবে না (যা কেবাঙ-এ পারত)। দূরবর্তী এক কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় প্রতিনিধিদের কেবলমাত্র নিজেরা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের এই পরিসরকে পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্য দিয়ে ব্রিটিশরা গড়ে তুলল। এভাবে কেবাঙ-এর গণ-পরিসরের সমান্তরাল ভাবে নির্মিত হলো অভিজাত মুষ্টিমেয়র রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিসর।

'স্বাধীন' ভারতের রাষ্ট্র এই সরকারি গম ও বাঙ্গো-র নীতিকে ব্রিটিশদের যোগ্য উত্তরসূরীর মতো চালিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু চালিয়েই নিয়ে যায় নি, বিস্তৃতও করেছে। বাঙ্গোকে আরও সম্প্রসারিত করে গোটা সিয়াঙ অঞ্চলের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 'বোগাম বোকাঙ' গঠন করেছে সিয়াঙ অঞ্চলের সমস্ত আদিগোষ্ঠীদের মধ্য থেকে প্রধানজনেদের মিলিত হওয়ার জন্য। এ কেবল গ্রামে গ্রামে দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিমাংসার জন্য নয়, এর মূল কাজ সরকারি 'উন্নয়ন'-এর কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা করা। শহুরে পেশাদারী আবহাওয়ায় ইংরেজি-তে রক্ষিত হিসাব-নিকাশ-দলিল-দস্তাবেজের মাঝে এইসব 'বোগাম বোকাঙ'-এ বিরাজ করেন অভিজাত, স্বার্থান্বেষী ও আমলা-মনস্করা। কেবাঙ-এর গণ পরিসর থেকে তা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

তবু কেবাঙ-এর গণ-পরিসর এখনও ধ্বংস হয় নি। গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তা এখনও জনজাতির পরম্পরাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল কিছু প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। এই প্রকাশগুলো এখনও জনজাতিদের ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্ফূরণ ঘটায়, ভোগবাদী পণ্য-অর্থনীতির মুহ্যমানতার বিরুদ্ধে যৌথজীবনের আনন্দকে সামনে নিয়ে আসে। এইরকমই একটি ঘটনা দিয়ে আপাতত আদিদের আখ্যান শেষ করি।

চিত্র ৯: ১৯৪০ সালে সিমঙ-এ সেতু তৈরি। চিত্রগ্রাহক- জন হাওয়ার্ড ফ্রাই উইলিয়ামস।

চিত্র ১০: ২০০২ সালে সিমঙ-এ সেতু তৈরি—আদি গ্রামবাসীরা গাছের গুঁড়ি টেনে আনছে।চিত্রগ্রাহক–মাইকেল আরম টার।

চিত্র ১১: ২০০২ সালে সিমঙ-এ সেতু তৈরি—আদি গ্রামবাসীরা সার বেঁধে পাথর বসাচ্ছে।চিত্রগ্রাহক–মাইকেল আরম টার।

চিত্র ১২: সিমঙ, ২০০২— তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেতু। চিত্রগ্রাহক–মাইকেল আরম টার।

২০০২-এর বসন্তে সিমঙ গ্রামের আদিরা যে পুরানো একটা লেগো (আদি শব্দ, যার অর্থ হলো গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি সেতু) নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। গ্রামের কেবাঙ-এ ঠিক হলো যে এর জন্য তারা কোনও কাঁচামাল-মজদুর-ইঞ্জিনিয়ার বাজার থেকে কিনবে না, তারা সেতুটা করবে পরম্পরাগত প্রথায়। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের সবাই সেতু তৈরির কাজে সামিল হলো এক উৎসবপালনের মেজাজে। প্রথমে একদল বের হলো এমন এক গাছের খোঁজে যার গুঁড়ি লম্বা-বরাবর কাটলে নদীর এপার থেকে ওপারে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট লম্বা হয় এবং মানুষ ও মোটরসাইকেল যাওয়ার মতো যথেষ্ট চওড়া হয়। উপযুক্ত গাছের খোঁজ পাওয়ার পর ছোট ছোট কুঠার দিয়ে সেই গাছ কাটা হলো। পরের দিন সবাই মিলে গাছের বিশাল গুঁড়ি নদীপারে টেনে নিয়ে যাওয়ার পালা। একসঙ্গে বহুজন মিলে গুঁড়ি টানতে লাগল আর সবাই মিলে গাইতে লাগল একটি প্রচলিত গান। গানটার নাম 'পিঁপড়েদের গান'– পিঁপড়েরা নাকি খাদ্য টেনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এই গানই গায়। পালা করে যারা টানছে, তাদের জল-খাদ্য জোটানোর জন্যও এলাহি আয়োজন। অনেকে আবার পরম্পরাগত কোনও না কোনও পোষাক পড়ে সেদিন কাজে নেমেছে। নদীর আগের শেষ খাড়াইটা দিয়ে নামিয়ে অবশেষে গাছের গুঁড়ি পৌঁছাল নদীর ধারে। গ্রামের লোকেরা তখন এক সারে দাঁড়িয়ে নদীর গর্ভ থেকে পাথর তুলে এনে দুই ধার উঁচু করল। তারপর ধরাধরি করে সেই গুঁড়ি উঁচু করা পাথরের উপর বসিয়ে দেওয়ার পরই সেতু তৈরি ব্যবহারের জন্য।

আনন্দময় যৌথশ্রমের মধ্য দিয়ে যৌথসম্পদ-সৃষ্টির এমন উপায় পুঁজি-প্রযুক্তির জানা নেই, সে পুঁজি-প্রযুক্তি যতই অসম্ভবকে সম্ভব করার বড়াই করুক না কেন।

[এর পরের অংশ আগামী সংখ্যায়]

সহায়ক গ্রন্থ

১। ভেরিয়ার এলউইন -এর লেখা 'এ ফিলজফি ফর নেফা'। বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৭ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

২। ভেরিয়ার এলউইন -এর লেখা 'মিথস অফ দি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া'। বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। আরক মেগু-র লেখা 'দি কারকোস অ্যান্ড দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত।

৪। আরক মেগু-র লেখা 'বোকার ল্যাঙ্গুয়েজ গাইড'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত।

৫। আদুক তায়েঙ-র লেখা 'মিলাঙ ফ্রেজ বুক'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত।

৬। তপোলি বরু-র লেখা 'তাঙ্গাম ল্যাঙ্গুয়েজ গাইড'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ২০০৪ সালে প্রকাশিত।

৭। এ মেগু-র লেখা 'বোরি ফ্রেজ বুক'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত।

৮। ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ- এর জার্নাল 'রেসারান'-এর ২০১৬ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ:

- আর এন কোলে-র লেখা 'লিঙ্গুয়িস্টিক রিসার্চ ইন অরুণাচল প্রদেশ'।
- তাপাঙ তাপাক-এর লেখা 'ঝুম সাইকেল: এগ্রিকালচারাল প্যাটার্ন অফ দি আদি'।
- গিন্ডু বোরাঙ-এর লেখা 'ট্রেড প্র্যাকটিসেস অফ দি আদি-পদমস'।

৯। দীপক কে সিঙ-এর লেখা 'স্টেটলেস ইন সাউথ এশিয়া'। বইটি সেজ পাবলিকেশনস থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত।

১০। মাইকেল আরম টার ও স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন-এর 'থ্রু দি আই অফ টাইম: ফটোগ্রাফস অফ অরুণাচল প্রদেশ, ১৮৫৯–২০০৬', ব্রিল থেকে ২০০৮-এ প্রকাশিত। লেখায় ব্যবহৃত ছবিগুলি এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

অরুণাচলের অস্তরাগ:
জনজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি

বিপ্লব নায়ক

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

দ্বিতীয় পর্ব:
আপাতনি জনজাতির কথা

আপাতনি জনজাতি অরুণাচল প্রদেশের সমস্ত জনজাতিদের মধ্যে স্বতন্ত্র বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, তারা দীর্ঘদিন ধরে অরুণাচল প্রদেশের একটি ২০ বর্গ মাইল এলাকার উপত্যকার সাতটি গ্রামের মধ্যেই বাস করে আসছে, যেখানে অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠী অনেক ছড়ানো ছিটানো অঞ্চলে বাস করে। দ্বিতীয়ত, আপাতনিরা দীর্ঘদিন ধরে কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা করে স্থিতু চাষ করে আসছে, যেখানে অন্য জনজাতিরা জঙ্গল কেটে তৈরি অস্থায়ী কৃষিজমিতে ঝুম চাষ করতেই অভ্যস্ত। এর ফলে জমির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অন্য জনজাতিদের তুলনায় তাদের স্বাতন্ত্র জন্ম নিয়েছে। অন্য জনজাতিদের মধ্যে কৃষিজমির উপর ব্যক্তি-মালিকানা দেখা যায় না, কৃষিজমি সেখানে গোষ্ঠী-মালিকানাধীন। আপাতনিদের মধ্যে কৃষিজমির উপর ব্যক্তি মালিকানা দেখা যায়।

অস্ট্রিয়ান নৃতাত্ত্বিক সি ভন ফুরের হাইমেনডর্ফ (আপাতনি জনজাতির সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে এই নৃতাত্তিক বহুভাবে জড়িত, আলোচনা এগোতে এগোতে তা আমরা ক্রমশঃ দেখব)-এর ১৯৪৪ সালে লেখা বিবরণী থেকে আমরা আপাতনি উপত্যকার তৎকালীন জমি-ব্যবস্থার একটা ছবি পাই। হাইমেনডর্ফ-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আপাতনি সমাজে একজনের প্রভাব বা সামাজিক অবস্থান নির্ভর করে তার ভূ-সম্পত্তির পরিমাণের উপর।

তিনি আপাতনিদের মধ্যে তিন ধরনের জমি-মালিকানা চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ধরন হল ব্যক্তি-মালিকানা। সমস্ত কৃষিজমি, সেচপ্রাপ্ত ধানচাষের জমি, শুকনো চাষের জমি, ভুট্টা-জনারের জন্য বাগান, শাক-সবজি-ফল চাষের বাগান, বাঁশঝাড়, পাইন ও অন্যান্য দরকারি গাছের চাষের জমি, বাস্তুভিটে— এই সব ব্যক্তি মালিকানাধীনে পড়ে। ব্যক্তি-মালিকানাধীন এই কৃষিজমি আপাতনিদের নিজেদের মধ্যেই কেবল মালিকানা-বদল হতে পারে মিঠুন বা অন্য কোনও গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে, টাকায় তা কেনাবেচা করা সম্ভব নয়।

মালিকানার দ্বিতীয় ধরন হল কৌম-মালিকানা। পশুর চারণভূমি, মৃতকে কবর দেওয়ার জায়গা (আপাতনিরা মৃত মানুষকে কবরস্থ করে) ও গ্রামের কাছে জঙ্গলের নির্দিষ্ট অঞ্চল কৌম-মালিকানাভুক্ত। সেখানে কেবল ওই বিশেষ কৌমের আপাতনিরাই পশু চরানোর, কবর দেওয়ার, শিকার করার বা জঙ্গলের সম্পদ সংগ্রহ করার অধিকারী।

মালিকানার তৃতীয় ধরন হল সাধারণ যৌথ মালিকানা। গ্রামের মধ্যের সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মাঠ, পশুর চারণক্ষেত্র ও আপাতনি-উপত্যকার আশপাশের জঙ্গলের নির্দিষ্ট অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে।

ভূসম্পদের উপর অধিকারের এই তৃস্তরীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আপাতনিরা এক সহযোগিতামূলক সমাজ গড়ে তুলেছে। কৃষিকাজ, কাপড় বোনা ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নানারকমের ঝুড়ি ও পাত্র বানানোয় কুশলতা অর্জন করেছে। আশেপাশের অন্যান্য জনজাতির মানুষরা, যেমন নিশি ও পার্বত্য মিরি জনজাতির মানুষরা তাদের খাদ্যশস্যের জন্য বহুলাংশেই আপাতনিদের সঙ্গে বিনিময়ের উপর নির্ভর করে।

হাগে গ্যাতি ঝুড়িতৈরি করছনে। আলোকচিত্রটি ২০০১ সালে আপাতনি উপত্যকায় স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের তোলা।

নিশি, পার্বত্য মিরি-র মতো তাদের নিকট-পড়শি জনজাতিদের সঙ্গে ছাড়া বাকি জগতের সঙ্গে সংস্পর্শহীন অবস্থায় আপাতনিরা এইভাবে তাদের উপত্যকায় মানবসভ্যতার এক বিশিষ্ট রূপ গড়ে তুলেছে শতকের পর শতক জুড়ে। উনিশ শতকে তারা ব্রিটিশ, অসমিয়া ও অন্যান্য ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। সেই সংস্পর্শের ফল কী হয়েছে তা আমরা

ক্রমশঃ দেখার চেষ্টা করব, কিন্তু প্রথমে শুরু করা যাক আপাতনিদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

আপাতনিদের নিজস্ব ভাষা আছে, আপাতনি ভাষা নামেই তা পরিচিত। এই ভাষা মূলত মুখের ভাষা, লেখার চল হয় নি, মান্য লিপিও গড়ে ওঠে নি। শ্রুতির ভিত্তিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত হয়ে এই ভাষার ভাণ্ডারে জমে আছে লোককথার বিপুল ঐশ্বর্য, যা আপাতনিদের পুরাণ, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিবরণ, লোকপ্রজ্ঞার বহুবর্ণ জগতকে ধরে রেখেছে। সেই লোককথার মধ্য দিয়েই আপাতনিদের জগতের সঙ্গে পরিচয় করা যাক।

সৃষ্টিতত্ত্ব

একদম প্রথমে ছিল না কিছুই, ছিল কেবল কোলইয়ুঙ কোলো, অর্থাৎ, নিরাকার। সে ছিল কামি-কামো, অর্থাৎ, তমসার সময়। পিনি সিয়ো নামের এক আত্মা থেকে উদ্ভূত হল নারী প্রজনন-শক্তি, যার নাম ঙ্গুনটি আনি। ঙ্গুনটি আনি জন্ম দিল আকাশ-পৃথিবী-র, এক নিরাকার আকাশের ও এক নিরাকার পৃথিবীর।

বহু আত্মার আবির্ভাব হল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আনি, অর্থাৎ, বদ বা বিপজ্জনক, যারা আকাশ-পৃথিবী-র বিরুদ্ধে দাঁড়াল। বদ আত্মারা আকাশ ও পৃথিবী-র মধ্যে রোগ সঞ্চারিত করত। যেহেতু পৃথিবী ও আকাশ তখনও পূর্ণবিকশিত নয়, এইসব বদ আত্মাদের বিপদ বড় হয়ে উঠেছিল। আকাশ-পৃথিবী-র জন্ম ও বেড়ে ওঠায় ব্যাঘাত তৈরি করত হিরি। গিরি ও গ্যোপু আকাশ-পৃথিবীর মধ্যে দুর্বলতা ও একাকীত্বের জন্ম দিত। উই তাদের অন্ত্রে ঘা তৈরি করত। ইয়াচু জন্ম দিত মানসিক সমস্যার। মিলয়া ও ডোপুঙ তৈরি করত মাথার যন্ত্রণা। আর তাইসিমে দিত রতিজ ব্যাধি। এই নবজাত আকাশ-পৃথিবী ছিল খুঁতে ভরা, যথাযথ আকার ছাড়াই যেহেতু তাদের জন্ম হয়েছিল।

তারপর আকাশ-পৃথিবীর বোন হিসাবে জন্ম নিল আমি দিনচি বানয়ি। সে চেষ্টা করল আকাশ-পৃথিবী-কে রোগমুক্ত করতে, কিন্তু তাইসিমে তাকেই রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে দিল। সে বিয়ে করল কোটু বুটাঙ-কোর্দা হোরমিঙ-কে, যে কি না ইঁদুর ও কাঠবিড়ালির উৎস। তার সেই স্বামীর দেহেও পা দিয়ে ব্যাধির সংক্রমণ ঘটল।

এরপর জন্ম নিল কোলয়ুঙ বুময়া ন্যিকাঙ নামে এক পুরোহিত আকাশ-পৃথিবী ও বদ আত্মাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য। আরও জন্ম নিল পোপি, উপদেশ দেওয়ার জন্য। পোপি পুরোহিতকে উপদেশ দিল আকাশ-পৃথিবীকে সারিয়ে তোলার জন্য বদ আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলি দিতে। হিরি-র উদ্দেশ্যে একটা শুয়োর বলি দেওয়া হল; আরও বলি দেওয়া হল গিরি-র জন্য একটা কুকুর, ইয়াচু-র জন্য একটি মুরগি; আর মিলয়া ও ডোপুঙ-কে উৎসর্গ করা হল এক টুকরো বাঁশ, উই-কে উৎসর্গ করা হল সুতো, গ্যোপু-কে উৎসর্গ করা হল বাঁশের চেঁচাড়ি, তাইসিমে-কে উৎসর্গ করা হল একটা তেঁতো পাতা। এর ফল ফলল। আকাশ-পৃথিবী রোগমুক্ত হল। আকাশ-পৃথিবী পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে সমর্থ হল। কিন্তু তাদের ভার বহন করার মতো স্তম্ভগুলো তো তখনও তৈরি হয় নি, সেগুলো তারপর তৈরি হল।

ধরা তৈরি হল নিকুন-এর থেকে। নিকুন-এর চুল পাখিদের বাসা হল, তার পাছা হল সমুদ্রগর্ভ। তার চোখ থেকে হল স্বচ্ছ হ্রদ, তার কাঁধ বিস্তৃত দিগন্তের রূপ নিল। তার বুক হয়ে উঠল জগতের ছাদ, তার হৃদয় হয়ে উঠল পাথর ও পাহাড়-পর্বত। তার বুকের হাড় হয়ে উঠল অরণ্য আর তার উদর পরিণত হল ঝোপ-ঝাড়-ঘাস-এ।

কোলয়ুঙ পিনি নামের আর এক আত্মার থেকে জন্ম নিল সূর্য, চাঁদ ও তারারা। আর এক আত্মা, ছাহা গাছপালা-শাক-সবজি নিয়ে এল।

সর্বশেষে আকাশ-পৃথিবী-র থেকে জন্ম নিল এক নারীশক্তি, যার নাম ছানটুঙ। এই ছানটুঙ-ই মানুষকে ও মানুষের আত্মাকে রক্ষা করে। এই ছানটুঙ-এর থেকেই তানি মানুষদের উদ্ভব। ছানটুঙ-এর বহু সন্তান, যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হল নেহা তানি। এই নেহা তানি-ই হল প্রথম মানুষ। তাকে অনেকে আবো তানি-ও বলে। আমরা আপাতনিরা এই আবো তানি-র বংশধর।

(কথক–হরি গ্রামের হাগে হীবা ও হাগে তাপা, রেরু (বুলা) গ্রামের পাদি তাসান ও মুদান তাগে গ্রামের মুদান দোন্যি। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন আপাতনি উপত্যকায় তাঁদের কাছ থেকে এই কথনগুলি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১০৯- ১১০ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল। কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

প্রত্যুষে দূর পর্বতচূড়া যেমন কুয়াশার মেঘ মেখে থাকে, আদি ইতিহাসও এখানে তেমন অতিকথার কুয়াশা মেখে আছে। এখানে বর্ণিত বিভিন্ন আত্মা মানুষের জগতের পাশাপাশি আর একটি জগতে অস্তিত্ববান বলে আপাতনিদের বিশ্বাস। এই দুই জগতের মধ্যে যোগাযোগরক্ষা ও তার মধ্য দিয়ে মানবসমাজের সাধারণ মঙ্গলের পথ উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত ক্রিয়াকর্মই আপাতনিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জগৎ তৈরি করেছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আবো তানি— প্রথম মানুষ— যার উত্তরপুরুষ হিসাবেই আপাতনিরা তাদের স্ব-পরিচয় নির্মাণ করে।

প্রব্রজন

আমরা আপাতনিরা এসেছি পর্বতমালার ওপারের দূর দেশ থেকে। কেউ কেউ বলে যে আমরা এসেছি মঙ্গোলিয়া থেকে, কিন্তু সঠিক কী তা আমাদের জানা নেই। একদম শুরুতে, আমাদের প্রথম পূর্বজরা কোলয়ুঙ কোলো-র সময়ে বাস করত। সে মানুষের জন্মের আগের কথা, জানি না কোন্ দেশে তখন বাস ছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের

সংস্কৃতি ও জীবনাচার সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত। সে ছিল ঙ্গুনটি আনি-র দেশ ও সময়।

সেখান থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রব্রজন করে এসেছিল উই সুপুঙ-এ ও তারপর ঈপিয়ো সুপুঙ-এ। এই ঈপিয়ো সুপুঙ-এই আতো তাজুঙ বাসা বেঁধেছিল। সে ছিল সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদের আরও বহু পূর্বপুরুষ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সেখানে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্য দেখা দিল। সুতরাং তারা একটা তুরি তুনী (ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য যৌথ আচার-অনুষ্ঠান) সংগঠিত করল। তার মধ্য দিয়ে প্রব্রজনের পথ নির্ধারণ করে তারা সেই পথে পাড়ি দিল। কিন্তু ঈপিয়ো সুপুঙ থেকে কিছুটা এগোনোর পরই তারা দেখল যে সে পথ অবরুদ্ধ। তখন লানচো সিবো নামে এক পুরুষ ও লানডু মানু নামে এক নারী একসঙ্গে শিঙা ফুঁকল এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই বাধা অতিক্রম করতে সফল হল। বাধা ডিঙিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

তারা চলল ঈপিয়ো চীলয়াঙ ও ঈপো কীপু-র পথ ধরে, কিন্তু আবার তাদের পথে বাধা পড়ল। তাদের পথে মাথা তুলে দাঁড়াল এক বিশাল পাহাড়, কালো ঘন ধোঁয়ার মতো কুয়াশার চাদরে মোড়া। চোখের দৃষ্টিতে কিছুই সেখানে ঠাউর করা যাচ্ছিল না। তখন আমাদের দুই পূর্বপুরুষ, চীলইয়াঙ তাগইয়াঙ ও কীপু তাপিন মিঠুন বলি দিয়ে দাপো আচার পালন করল এবং তার মধ্য দিয়ে ঈপিয়ো চীলয়াঙ ও ঈপো কীপু-কে বশে আনল। তার মধ্য দিয়ে সামনে এগোনোর পথ আবার খুলে গেল। পাহাড়চূড়ায় আনন্দ-ভোজ সেরে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাহাড় পেরিয়ে গেল।

যেতে যেতে আবার এক উঁচু পাহাড় পথ আটকে দাঁড়াল, পূর্বপুরুষরা তাকেও টপকে যেতে পারল। তারপর তারা পৌঁছাল কর লেম্বা বলে এক জায়গায়, যেখানে তাদের বহুজন ফাঁদে পড়ে মারা গেল। বাকিরা এগিয়ে চলল। তাদের পথে আবার বাধা পড়ল, তারা ঘুরপথে সে বাধা কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

এভাবে তারা এসে পৌঁছাল ন্যিমে-তে, যেখানে বহু পূর্বপুরুষ সেই অঞ্চলের লোকজীবনের মধ্যে মিশে গেল। ন্যিমে-র নারীরা নদীর ঘাস থেকে তৈরি গয়না ও পুঁতি পড়ত, তাদের কাছ থেকে তা শিখেছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা। ন্যিমে-র মানুষদের মধ্যে ছিল দুটি গোষ্ঠী– সেখানকার আদি বাসিন্দারা হল নিকুন ন্যিমে আর বাকিরা হল নেচো ন্যিমে, নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই তারা বিয়ে করত। নিকুন-রা এসেছিল তুপে থেকে আর নেচো-রা এসেছিল হিকুন থেকে।

ন্যিমে-র রাজা ছিল পায়ান রাদে ন্যিমে, সে বিয়ে করেছিল পুকুন পুরি-কে। তাদের ছিল ছয় মেয়ে। সেই ছয় মেয়ের মধ্যে তিনজনের সন্তান-সন্ততি থেকেই আমরা আপাতনিরা এসেছি। আমাদের হাও গ্রামসমষ্টির (তাজাঙ, রেরু ও কালুঙ– এই তিন মূল গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমানের বুলা গ্রাম; এই বুলা গ্রাম ও হরি গ্রাম মিলে হাও গ্রামসমষ্টি) মানুষজন পুকুন-কন্যা আনে হায়া-র সঙ্গে আবা তাবু-র বিয়ের ফলে গড়ে ওঠা পরিবার থেকে এসেছে। দীবো গ্রামসমষ্টির (দুত্তা, মুদান তাগে ও মিচি বামিন গ্রামের সমষ্টিবদ্ধ নাম দীবো গ্রামসমষ্টি) মানুষজন এসেছে পুকুন-কন্যা আনে বেন্দি-র সঙ্গে তাসো দারবো-র বিবাহজাত পরিবার থেকে আর হঙ গ্রামের মানুষজন এসেছে পুকুন-কন্যা লোলি ইয়ারি-র সঙ্গে পাবিন হীপা-র বিবাহজাত পরিবার থেকে।

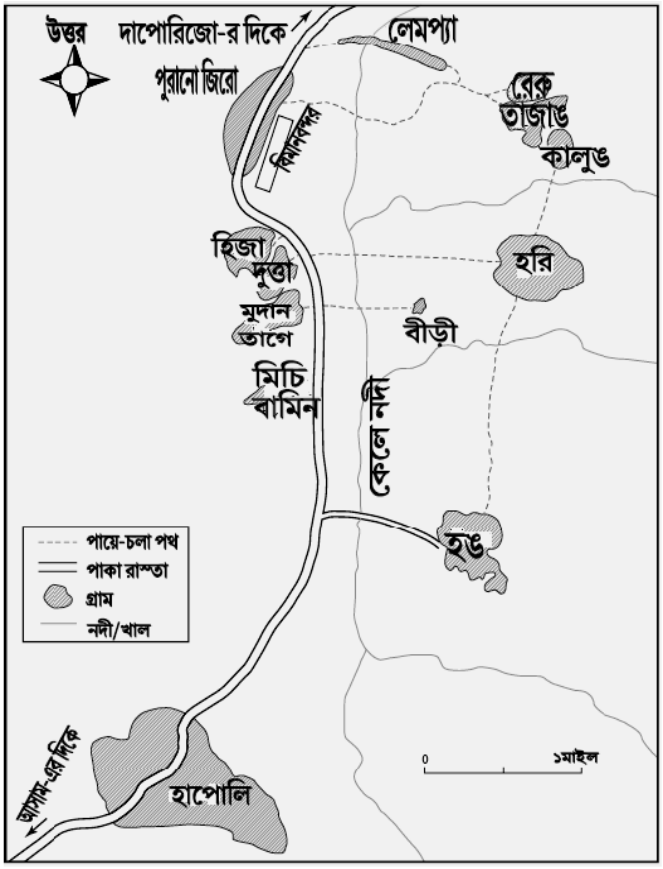

আপাতনি উপত্যকার মানচিত্র

ন্যিমে ছেড়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা চলতে চলতে চীলইয়াঙ পাহাড় ও মুদো পাহাড় পেরিয়ে ডুডিং লেম্বা-য় পৌঁছে দেখল যে একটা ঈগল পাখি আর একটা বানর তাদের রাস্তা আটকে রেখেছে। আমাদের বহু পূর্বপুরুষ সেখানে প্রাণ হারাল। শেষপর্যন্ত এক নারী তার বুকের দুধে বিষ দিয়ে তা জলে মিশিয়ে তা দিয়ে সেই ঈগল ও বানরকে হত্যা করল। পশু ও মানুষের মধ্যে সংঘাত সেই থেকেই শুরু হল, কিন্তু তা আমাদের পূর্বপুরুষদের আরও এগোনোর পথ খুলে দিল।

এরপর আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে পৌঁছাল সাঙপো উপত্যকার মুদো সুপুঙ নামের এক জায়গায়। আমরা আজ আর জানি না মুদো সুপুঙ ঠিক কোন্ জায়গাটা, কিন্তু সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। একদিন দুজন মেয়ে ধানক্ষেতে গিয়েছিল তাসিন পোকা সংগ্রহ করার জন্য। সেই সময়ে ড্রী উৎসব পালন করা হচ্ছিল, তাই ওই পোকা ধরা তখন নিষেধ ছিল। তা সত্ত্বেও তারা ওই পোকা সংগ্রহ

করল। এর ফলে ধানক্ষেতের সব ফসল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর আতো দিউ তার নিজের বাড়িতে দ্বিতীয়বার আবার ড্রী উৎসব পালন করল। আতো নিবো সেখানে জিলাঙ চাদর (পুরোহিতরা ও গ্রামসভা বুলইয়াঙ-এর সদস্যরা এই বিশেষ নকশার চাদর সম্মানসূচক হিসাবে পরে থাকে) গায়ে দিয়ে আতো দিউ-এর এর বাড়িতে এসে পুরোহিতের কাজ সমাপন করে।

আমাদের প্রধান উৎসবগুলো মুদো সুপুঙ-য়েই প্রথম পালিত হয়েছিল। মিয়োকো (মার্চ-এপ্রিলে পালিত হয়) প্রথম উদযাপন করেছিল আতো দিউ, প্রথম মুরুঙ (ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পালিত হয়) করেছিল আতো হাপে, প্রথম সুবু (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারিতে ও মিয়োকোর সময় পালিত মুরুঙ-এর একটি সংস্করণ) করেছিল আতো মিপু, আর আতো পীসান করেছিল প্রথম ইমো হুনীন (পোকা, শিলাবৃষ্টি ও খরার হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে জুলাই-আগস্টে করা হয়)।

মুদো সুপুঙ-য়ে বহু প্রজন্ম ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও কিছুজন ঠিক করল যে নতুন জায়গায় নতুন করে জীবন পাততে তারা আবার বের হবে। তাই তারা আবার তুরি তুনী সংগঠিত করে যাত্রার দিকনির্ণয় করে পাড়ি দিল। সবাই এক রাস্তাতে গেল না। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা রাস্তা ধরল। এই সময় আবো তানি তার এই উত্তরপুরুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত বস্তু ভাগ করে দিয়েছিল। ন্যিমে (তিব্বত)-র মানুষরা পেয়েছিল তেঁতো পাতা আর বন্য জীবজন্তু, সুলুঙ-রা পেয়েছিল সাগো গাছ, মিসান (নিশি ও পার্বত্য মিরি)-রা পেয়েছিল মকাই আর বুনো বাঁশ, হালইয়াঙ (অসমিয়া, অনাদিবাসী, সমতলের বাসিন্দা, ভারতীয় বা বহির্জগতের মানুষ)-রা পেয়েছিল সুপুরি, নুন, পিতলের বাসনকোসন ও বিশেষ ধরনের বস্ত্র। আমরা আপাতনিরা পেয়েছিলাম ধান, দেবদারু গাছ ও বাঁশের চাষ।

হালইয়াঙ-রা যখন জঙ্গল ছেড়ে পাহাড় থেকে নেমে সমতলের দিকে চলে গেল, তখন তারা মিসান ও আপাতনি-দের পথ আটকাতে গাছ কেটে সেই গুঁড়ি দিয়ে রাস্তা আটকে দিয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা পাহাড়েই থাকি। সে অবশ্য পরের কথা, তার আগের কথা আগে বলা যাক।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাত্রা শুরু করার আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই একসাথে একটা বড় ভোজের আসরে মিলিত হয়েছিল। প্রথমে তারা একটা গাছ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিল যাতে সকলের মঙ্গল হয়, তারপর তারা মিঠুন বলি দিয়েছিল। মিঠুন বলি দেওয়ার সময় নিশিদের গা-হাত-পা বাজে ভাবে কেটে গিয়েছিল, আপাতনিদেরও আঙুল কেটে গিয়েছিল। সম্পন্নজনেরা বেশি মিঠুন বলি দিয়ে বেশি ডিঙ্গিয়া ও গিয়োতি উপহার বিলি করেছিল। উপহার আদানপ্রদান অবশ্য হয়েছিল সবার মধ্যেই। সবে তখন ভোর হয়েছে, সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই একসঙ্গে বসে ভোজ সেরেছিল। তখন থেকেই আমাদের মধ্যে উপহার আদানপ্রদানের আচার চালু হয়েছে। (এই উপহার, মূলত বলি দেওয়া মিঠুনের বিভিন্ন দেহাংশ ও মাংস, আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে আপাতনিদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব-সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয় বা অতীতে তৈরি সম্পর্ক জোরদার হয়। ডিঙ্গিয়া উপহার বিলি করতে হয় নিজের কৌমের বাইরে অন্যান্য কৌমের একজন করে মোট তিন-চারজনকে। এর মধ্য দিয়ে আদানপ্রদানকারীরা ডিঙ্গিয়া-বন্ধু বা বুনীন-বন্ধু-তে পরিণত হয়, একে অপরের যে কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটে বা বিপদে-আপদে বুনীন-বন্ধুদের একে অপরকে সাহায্য করা বাধ্যতামূলক। বুনীন-বন্ধুত্ব কেউ নতুন করে কারও সঙ্গে পাততে পারে, কিন্তু বুনীন বন্ধুত্ব কেউ ভেঙে দিতে পারে না। গিয়োতি আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েও অপরাপরের মধ্যে এমন সহযোগিতা-সহমর্মীতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইরকম সামাজিক সম্পর্কবন্ধন আরও নানা রকমের আছে, যেমন– পিনইয়াঙ, আলী কুটিন।)

যৌথভোজ সমাপন হলে দলগুলো তাদের আলাদা আলাদা পথ ধরল।

মুদো সুপুঙ থেকে মুদো দোকান যাওয়ার পথে আপাতনি ও নিশি-দের মধ্যে নানা বিষয়ে, বিশেষ করে রতিক্রিয়া ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিল। যেমন, একজন একটা পিতলের থালা চুরি করল— আমাদের ইতিহাসে চুরির ঘটনা সেই প্রথম। একজন পুরোহিত তখন সিদ্ধান্ত নিল যে তাকে জরিমানা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মুদো দোকান-এ পৌঁছে গড়ে তোলা হয়েছিল সবচেয়ে বিখ্যাত লাপাঙ-টি। (আপাতনিদের প্রতিটি গ্রামে কাঠের তক্তা দিয়ে একটা উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়, যেখানে যৌথ আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয়। একেই বলে লাপাঙ। সম্প্রতিকালে, কাঠের তক্তার বদলে বহুক্ষেত্রে কংক্রিটের লাপাঙ তৈরি হচ্ছে।) সেখানে একটা প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় তাবিয়া তাগে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে এনেছিল, হাও নিয়ে এসেছিল এক ভালুকের মতো এক অদ্ভুত জন্তু, হঙ নিয়ে এসেছিল একটা বাঘ। মিচি বামিন, মুদান তাগে, দুত্তা ও হিজা নিয়ে এসেছিল বিভিন্ন পাখি আর শুয়োর। হরি আর হিজা-র দুসু ও তানইয়াঙ কৌমের লোকেরা একটা মানুষের মাথা শিকার করে নিয়ে এসেছিল।

মুদো দোকান-এ বসবাসকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বীটু আর তানইয়ো-র লোকজনের সংঘাত তৈরি হয়েছিল। তখন আবো পিবো মিঠুনের মাথার খুলি দিয়ে সেই শত্রুদের এমন ভয় দেখিয়েছিল যে শত্রুরা সব সেই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছিল। এর কিছুদিন পরে মিঠুন চুরির প্রথম ঘটনাটি ঘটল। বীড়ী দোন্যি-র মিঠুন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেখা গেল যে লালি দোন্যি ও সিলি দোন্যি সেই মিঠুন চুরি করেছে। কিন্তু শেষাবধি, মুদো

দোকান-এ মানুষে-মানুষে সহযোগিতার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আরো শক্তপোক্ত করা হয়েছিল। উপহার হিসাবে আদানপ্রদান করা জিনিষগুলো আরো ভালো করা হয়েছিল, যেমন, শুয়োরের চামড়া, হর্ণবিল পাখি, কাঠবিড়ালি, ইঁদুর ও অন্য বন্যজন্তু উপহার দেওয়া চালু হয়েছিল, ফলে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছিল।

আপাতনি উপত্যকার একটি গ্রামের লাপাঙ। লাপাঙ-এর উপর আপাতনি পুরোহিতরা কোনও আচার পালন করছেন। চারদিকে সমবেত গ্রামবাসীরা। ১৯৪৪/১৯৪৫সালে ফুরেরহাইমেনডর্ফের তোলা আলোকচিত্র।

তারপর আবার একদিন ভবিষ্যনির্ধারণের আচার পালন করা হল যাত্রার পরবর্তী পথ নির্ধারণ করার জন্য। নির্ধারিত পথে আবার যাত্রা শুরু হল। সেই পথ ধরে পূর্বপুরুষরা পৌঁছাল কুরু-কিমে নদীর ধারে। সেই নদীর গভীর স্রোত অনবরত গর্জন করতে করতে বয়ে চলে। সেখানে নানা ক্ষতিকারক পোকামাকড়ও ছিল। পূর্বপুরুষরা সেই নদী পার হতে পারল না, নদীর ধারেই থিতু হয়ে বসল। কুড়ি প্রজন্ম ধরে তারা সেখানেই বাস করল। তারপর নিবো রুচি নামে এক সাঁতারে ওস্তাদ ছোট্ট ছেলে একটা নৌকার ব্যবহার করে সবাইকে নদী পার হতে সাহায্য করল।

নদী পার হওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে তারা আবার এক উঁচু কুয়াশা-ঘেরা পাহাড়ের সামনে এসে পড়ল। সেই পাহাড়কে বেড়ি দিয়ে উৎরাইয়ে নেমে তারা দেখল যে তাদের সামনে আবার কুরু-কিমে নদী, দ্বিতীয়বার তাকে পার হতে হবে। এবার অবশ্য মিঠুন বলি দেওয়ার পর তারা সহজেই নদী পার হয়ে যেতে পারল।

সবাই পার হওয়ার পর হালইয়াঙ-রা বাকিদের ছেড়ে এগিয়ে গেল এবং পানিয়োর নদীর ধারে এসে পৌঁছাল। ভাটির দিকে যাওয়ার পথে তারা সানজি মীরি গাছের গায়ে কাটা-চিহ্ন রাখতে রাখতে গেল। কিন্তু সে গাছ কাটার পর খুব তাড়াতাড়িই আবার আগের রঙ ফিরে আসে। এইভাবে হালইয়াঙ-রা তাদের যাওয়ার পথের কোনও চিহ্ন রেখে গেল না। আপাতনি-রা যখন সেখানে পৌঁছে কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না, তারা ভাবল যে হালইয়াঙ-রা বুঝি অনেকদিন আগেই সেখান ছেড়ে গেছে, এখন বুঝি বহু দূরে চলে গেছে। তাই আপাতনিরা আবার ঘুরে পিছিয়ে গিয়ে জিরো-তে এল। পানিওর নদী বরাবর নেমে সেই প্রায় নীপকো অবধি (নীপকো অবধি— নীপকো মানে NEEPCO, আর্থাৎ, নর্থইস্ট ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন কোম্পানি। এই কোম্পানি ২০০৩ সালে পানিয়োর নদীর ওপর একটি বাঁধ বানিয়েছিল। 'নীপকো অবধি' বলতে ওই বাঁধটি এখন যেখানে সেই স্থান অবধি বোঝান হয়েছে।) গিয়ে তারা হাগে বোরো বলে একটা জায়গায় পৌঁছাল।

হাগে বোরো-য় আমাদের পূর্বপুরুষরা আবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা পথ ধরে চলল, যে পথ শেষ অবধি তাদের পৌঁছে দিয়েছিল আপাতনি উপত্যকার তাদের গ্রামগুলোয়। আমাদের হাও গ্রামেদের পূর্বপুরুষরা নদীর ধার থেকে সিলো-পথ ধরে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠেছিল, তারপর প্যিউতু-পথ ধরে এগিয়েছিল। হঙ গ্রামের পূর্বপুরুষরা উপরে না উঠে নদী বরাবর সীকে-পথ ধরে এগিয়ে তারপর সিপয়ু গিয়ায়ু-পথ ধরেছিল। দীবো-র লোকেরা নদী পার হয়ে চীলইয়াঙ-পথ ধরেছিল। হরি গ্রামের পূর্বপুরুষরা প্যিউতু-পথ ধরে আসার সময় তাবইয়াঙ-তালইয়াঙ-এর মানুষদের প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল, কিন্তু তারা প্রতিরোধকারীদের পরাজিত করেছিল।

(কথক– হরি গ্রামের ৬৫ বছর বয়স্ক হাগে তাপা। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১১১- ১১৬ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল।কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

মঙ্গোলিয়া-র কাছাকাছি কোনও অঞ্চল থেকে দীর্ঘ প্রব্রজন, নানা ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া-র এক বহু শতক ব্যাপী ইতিহাস এখানে বলা হচ্ছে। একটা বিষয়কে একটু খেয়াল করা যাক। বিষয়টা হল হালইয়াঙ-দের প্রসঙ্গ। আপাতনিরা মনে করে যে হালইয়াঙ-রাও ইতিহাসের দূরতম কোনও সময়ে পাহাড়ি জনজাতিগুলোর সঙ্গে একইসাথে ছিল। কোনও এক সন্ধিক্ষণে তারা পৃথক হয়ে সমতলভূমিতে নেমে যায়, বাকিরা যায় নি। কেন বাকিরা যায় নি বা যেতে পারে নি তা নিয়ে দুটি বৃত্তান্ত এই কথনে উপস্থিত। একটা বৃত্তান্তে বলা হচ্ছে যে হালইয়াঙরা নেমে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে বাকিদের রাস্তা আটকে দিয়ে গিয়েছিল গাছ-পাথর ফেলে। অর্থাৎ, হালইয়াঙদের বিরুদ্ধে অন্যদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার একটা অভিযোগ আনা হচ্ছে। দ্বিতীয় বৃত্তান্তে তাদের রেখে যাওয়া পথচিহ্ন উবে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, এখানে হালইয়াঙদের উপর দোষারোপের সুর তেমন নেই। সুতরাং, হালইয়াঙদের প্রতি দুরকম মনোভাব আমরা এখানে দেখছি— একটা মনোভাবে সন্দেহ ও অবিশ্বাস, অন্য মনোভাব সহজ ও স্বাভাবিক। এই দুইরকম মনোভাব একই কথনে আসা কিছু তাৎপর্য বহন করে কি ? যেমন, এভাবে একটা তাৎপর্য ভাবা যেতে পারে। কথন

শ্রুতির মধ্য দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত হয়। সেই পথে তার মধ্যে যোগ-বিয়োগও ঘটতে থাকে, যা এক এক প্রজন্মের বৈশিষ্টমূলক ছাপ বহন করে। এভাবে, হালইয়াঙদের সম্পর্কে দুটো মনোভাব কী আলাদা দুটো প্রজন্মের ছাপ ? হালইয়াঙদের সম্পর্কে আপাতনিদের মনোভাবে পরিবর্তন হয়েছে, যার ছাপ এইভাবে ধরা পড়েছে ? পরবর্তীকালে হালইয়াঙদের সঙ্গে আপাতনিদের পুনর্বার সংস্পর্শে আসার ফলাফল থেকে তৈরি ছাপও হয়ত এর মধ্যে বিধৃত। আলোচনা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তা দেখা যাবে।

আপাতনি উপত্যকায় বাস-পত্তন

পাহাড় পার হওয়ার পর আমাদের পূর্বপুরুষরা একটা মিঠুন বলি দিল। তারা এসে পৌঁছাল সিলো সুপুঙ (জিরো) আর সিপ্যু সুপুঙ (পুরানো জিরো-র কাছে)-য়ে। এইখানে বাসা বেঁধে আমাদের পূর্বপুরুষরা সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

সিলো সুপুঙ-এর মাঝে বীড়ী নামে এক বসতি ছিল, যার প্রধান ছিল আতো দিয়ু। সে সেখানে প্রথম মিয়োকো উৎসব পালন করেছিল বিয়ু তাড়ু, বিমা তামা আর বিহি তাই-য়ের সঙ্গে। তার বংশের বিমা তাম্যা আর এক বিখ্যাত জন। তিনি প্রথম সেচ-খাল খনন করেছিলেন। সে খুব সম্পন্ন ছিল, অনেক শুয়োর সে পালন করত, কিন্তু তার কোনও পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল দশজন কন্যাসন্তান ছিল। সে তার ছয় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল হীচি (উপত্যকার পশ্চিমদিকের গ্রামসমূহ) গ্রামগুলোর প্রধানদের সঙ্গে আর বাকি চারজনকে বিয়ে দিয়েছিল হীটী (উপত্যকার পূর্বদিকের গ্রামসমূহ) গ্রামগুলোর প্রধানদের সঙ্গে। এইভাবে আতো দিয়ু-র বংশধররা গোটা উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

আপাতনি উপত্যকা। ২০০২ সালে মাইকেল আরম টার-এর তোলা ছবি।

বহু বহু দিন আগে আপাতনিরা যখন এখানে প্রথম এল, তখন এই আপাতনি উপত্যকা ছিল এক বিশাল জলাজমি, আর এখানকার জলায় বাস করত বুরা নামের এক অদ্ভুত পশু। বুরা যে ঠিক কেমন ছিল, আজ আমরা আর তা বলতে পারব না, সম্ভবত বড়সড় কুমিরের মতো (কেউ আবার বলে অতিকায় শুয়োরের মতো) কোনও জন্তু ছিল তা। যাই হোক না কেন, তখন কোনও নদী বা মাঠ ছিল না, ছিল কেবল জলা আর এই বুরা। একদিন আপাতনিরা দেখল যে জলার মাঝে বুরা এক গভীর গর্ত খুঁড়ছে যাতে জলের নীচে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা ভাবল যে বুরা বুঝি তাদের আক্রমণ করবে। এই ভেবে ভয় পেয়ে তারা পালাল। তারপর দুটো ম্যাম্যা (বিশেষ শক্তিধর দুটো তামার থালা, একটি পুরুষ, অন্যটি নারী) ঘর ছেড়ে বের হল বুরা-র সঙ্গে লড়াই করতে। বুরা-র সঙ্গে সেই ভীষণ যুদ্ধে নারী ম্যাম্যা-র প্রাণ গেল, কিন্তু পুরুষ ম্যাম্যা এক কোপে বুরা-র মাথা কেটে তাকে হত্যা করল। যুদ্ধশেষে ম্যাম্যা যখন ঘরে ফিরল, ঘরের পুরুষটি ছিল বাইরে। যুদ্ধোন্মাদনায় ম্যাম্যা তখন এতই উন্মত্ত যে সে ঘরের ছেলেটির মাথাও এক কোপে কেটে ফেলল। ঘরের পুরুষ ঘরে ফিরে যখন তার পুত্রের শব দেখল, তখন এক মুষল নিয়ে সে ম্যাম্যা-র দিকে তেড়ে গেল। ম্যাম্যা পালিয়ে গিয়ে বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রইল। সেই বাঁশের ঝাড়ে এক কাটা বাঁশের ধারালো গোড়ার খোঁচায় তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। আজ অবধি তামার থালার এক চোখ নষ্ট হয়ে আছে। কখনও কখনও এই ম্যাম্যা-কে ব্যবহার করা হয় চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য। আমরা ম্যাম্যা-র ওপর চালের গুঁড়ো ঘসে তাকে তৈরি করি, তারপর পুরোহিত নির্দিষ্ট আচার পালন করেন।

(কথক– কালুঙ গ্রামের ৪০ বছর বয়স্ক কালুঙ লেন্টো। ২০০১ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল।কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

২০০২ সাল। কালুঙ গ্রামের লোড তালইয়াঙ-এর পুত্রবধূ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ম্যাম্যা থালা দেখাচ্ছে। ম্যাম্যা-র নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখের চিহ্ন থালাটির ভাঙা অংশ। চিত্রগ্রাহক–স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন।

লোককথায় অনেক জড়বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তির মানুষীকরণ হয়, এখানে একজন মানুষের জড়বস্তুকরণ হয়েছে। মানুষ ম্যাম্যা রূপান্তরিত হয়েছে ধাতুর থালায়।

বস্ত্রবয়ন

প্রথমে আমাদের পূর্বপুরুষরা নানা উপায়ে কাপড় বোনার চেষ্টা করেছিল। একটা বানরের গা থেকে লোম তুলে তা দিয়ে বোনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা কাজে দিল না। তারপর তারা উড়ুক্কু কাঠবিড়ালীর গায়ের পশম ব্যবহার করার চেষ্টা করল, কিন্তু তা এত সহজেই ছিঁড়ে যায় যে তাও কাজে এল না। কান্টু ইঁদুরের লোম ব্যবহারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছিল। ডিকা পাখির পালক ব্যবহারের চেষ্টাও কাজে আসে নি।

শেষ অবধি তারা ভেড়ার গায়ের পশমী লোম ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু সেই লোম থেকে তৈরি সুতোও যথেষ্ট মিহি হতো না। তাই হিন্টী আনী তার নিজের চুল থেকে মিহি সুতো তৈরি করল। হিন্টী আনী কালো চুল, নীল চুল ও সাদা চুল তৈরি করেছিল। মেয়েরা সেই চুল সংগ্রহ করে আনত আর তার থেকে সুতো বুনত। হিন্টী আনীর চুল দিয়ে মেয়েরা দারুণ শাল বুনতে পারত। হিন্টী আনী-র নিজের মাথার খুলি পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো কুরু নদীর ধারের মোব্যু গাছের পাতা থেকে রঙ তৈরির জন্য। আর কিমে নদীর ধারের পায়্যে গাছের পাতা থেঁতো করে রঙ তৈরি করার জন্য থেঁতন-শিলা হিসাবে ব্যবহার করা হতো হিন্টী আনী-র কোমরের নিম্নভাগকে। এইভাবেই আমাদের শাল বোনার রঙ তৈরি হয়েছিল।

আমরা, আপাতনিরা, তুলো চাষ করতাম না। তুলো চাষ করত নিশি-রা। নিশি-দের কাছ থেকেই আমরা তুলো পেতাম। আমরা নিশি-দের দিতাম চাল আর খাদ্যোপযোগী পোকামাকড়, তার বদলে নিশি-রা আমাদের দিত তুলো আর শুয়োর। তুলো পাওয়ার পর আমরা গোটা রাত ধরে একটা কাঠের লাঠি দিয়ে বেলে তাকে বিছাতাম। তারপর একটা কাঠের কাঠামো ব্যবহার করে সুতো কাটা হতো আর বাঁশের ফালির উপর জড়িয়ে রাখা হতো। তারপর সাবধানে সেই জড়িয়ে রাখা সুতোর পাক খুলে এক পাত্র জলের মধ্যে ধানভাঙা চালের সঙ্গে সব সুতো চোবানো হতো। তারপর সেই পাত্র আগুনের ওপর দিয়ে ফোটানো হতো যতক্ষণ না চালগুলো আধ-সেদ্ধ হচ্ছে। তারপর আগুন থেকে পাত্র নামিয়ে, সুতোগুলো বের করে তাদের রোদে শুকোতে দেওয়া হতো। এরপর সেই সুতো দিয়ে কাপড় বোনা হতো। সেই আগেকার দিনে কমলা রঙ তৈরির জন্য আমরা জঙ্গলে সাঙ্কে গাছ খুঁজতে যেতাম। সাঙ্কে গাছের বাকল তুলে সরু সরু টুকরোয় কেটে নিয়ে আসা হতো। সেই টুকরোগুলো একটা পাত্রের মধ্যে সুতো, চাল আর জলের সঙ্গে দিয়ে সারারাত ফোটানো হতো। এই ভাবেই তৈরি হতো কমলা সুতো যা দিয়ে বিখ্যাত 'চোখ-মুখ' নকশা কাপড়ে বোনা হতো।

লাল রঙ তৈরির জন্য জঙ্গল থেকে একপ্রকার লতানে গাছ সংগ্রহ করা হতো ও একইভাবে সারারাত ফোটানো হতো।

সুতোকে ধানচারা-বোনা ক্ষেতের জলের নীচে একমাস চুবিয়ে রাখলে কালো রঙের সুতো পাওয়া যেত।

নীল রঙের সুতো তৈরি করত নিশি-দের তারু ও লাজি কৌমের মানুষেরা। আমাদের মায়েরা ওই নিশিদের লম্বা লম্বা যৌথঘরগুলোয় গিয়ে ওই নীল সুতো নিয়ে আসত।

ভেড়ার পশম আসত নিশি-দের বসত ছাড়িয়ে আরও দূর দেশ থেকে, যেখানে ভেড়া পাওয়া যেত। পশমে বোনা কম্বল আমাদের এখানে আসত। সেই কম্বল খুলে পশম দিয়ে আমরা আবার শাল বুনতাম নিজেরা।

জামা ও ঘাগরা বোনার জন্য নিশি-দের কাছ থেকে পাওয়া তুলো ব্যবহার করা হতো। জামা মোটা সুতো দিয়েই বোনা হতো, কিন্তু ঘাগরার জন্য লাগত মিহি সুতো।

বিভিন্ন ধরনের শাল বোনা হতো, যেমন— জিলাঙ (পুরোহিত ও গ্রামসভার সদস্যদের জন্য), প্যামিন (কমলা রঙের শাল), মিসান (নিশি ও পার্বত্য মিরি-দের জন্য) এবং ল্যাপু (সাধারণ ব্যবহারের জন্য)।

আজকাল হালইয়াঙ-দের কাছ থেকে যে সুতো আমরা পাই তা খুবই সমঞ্জস ও মিহি। এছাড়া বয়নের উপকরণ আমাদের খুব একটা বদলায় নি, কেবল হস্তকলার নৈপুণ্যে অনেক নতুন নতুন নকশা আমরা তৈরি করেছি।

(কথক– হরি গ্রামের ৬০ বছর বয়স্ক হাগে ইয়াব ইয়ুঙ। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১২৪- ১২৫ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল।কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

বহির্দৃষ্টিতে আপাতনিরা: প্রথম আখ্যান

১৮৯০-এর দশকের শেষদিকে এইচ এম ক্রো নামের এক ইউরোপিয় চা-বাগিচা-মালিক আপাতনি উপত্যকায় আসেন। যতদূর জানা যায়, এই উপত্যকায় পা ফেলা তিনিই প্রথম 'বাইরের লোক'। ক্রো-র অভিযান করার শখ ছিল, তাই বড়দিনের ছুটিতে কিছু ডাফলা (নিশি-দের সমতলের লোকরা তুচ্ছার্থে ডাফলা বলে ডাকত) মালবাহককে নিয়ে 'অজানা' আপাতনি উপত্যকায় পৌঁছানোর জন্য বেরিয়ে পড়েন। উপহার হিসাবে দেওয়ার জন্য তিনি সঙ্গে কিছু পুঁতি, নুন ও রেশম বস্ত্র নিয়েছিলেন। আপাতনি উপত্যকায় পৌঁছে তিনি আপাতনিদের সমাজ দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া বর্ণনা ভেরিয়ের এলউইন 'ফিলজফি ফর নেফা' বইতে(দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা:১৩-১৪) উদ্ধৃত করেছেন। সেখান থেকে জানা যায় যে ক্রো দেখেছিলেন যে এই দুর্গম উপত্যকায়

বাস করছে একটি অন্যন্ত সংঘবদ্ধ ও পরিশ্রমী জাতি। তারা সেচের বিস্তৃত ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যার ফলে তাদের কৃষিজমিগুলো উচ্চফলনদায়ক। লাঙ্গলের ব্যবহার তারা জানে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের লম্বা বাঁটযুক্ত কোদাল ব্যবহার করেই নিজেদের ও তাদের পড়শী জাতিদের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট ফসল উৎপাদন করে। ডাফলাদের বাধার ফলে তারা সমতলে লেনদেন করতে যায় না। তা সত্ত্বেও তাদের জীবন মোটের উপর সম্পদশালী ও আনন্দময়।

উপনিবেশ-শাসকদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত

আমার দাদুর কাছ থেকে শুনেছি যে ওই সময় (১৮৯৭ সাল)-এর আগে কয়েকজন আপাতনি সমতলে গিয়েছিল বিনিময় করতে, প্রধানত নুনের জন্য। কেউ কেউ চা-বাগানেও কাজ করতে গিয়েছিল। বিভিন্ন কারণে তাদের বহুজন সেখানে মারা যায়।

সমতলের সেনারা আমাদের উপত্যকায় আসার কয়েক মাস আগে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। নিশি-দের গ্রাম লিনিয়া-য় একটা খুনের ঘটনা ঘটেছিল। যে নিশি খুন করেছিল, হরি গ্রামের এক আপাতনির সঙ্গে ছিল তার মানইয়াঙ-সম্পর্ক (উপহার-বিনিময়ের আচারপালনের মধ্য দিয়ে একজন আপাতনি ও একজন নিশি-র মধ্যে বন্ধুত্ব-সহযোগিতার সম্পর্ক)। খুনের পর সেই নিশি পালিয়ে এসে হরি গ্রামের সেই আপাতনির বাড়িতে আত্মগোপন করে। আপাতনিটি তাকে কিছুদিন নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখার পর নিরাপত্তার জন্য তাকে সমতলের কাছে একটা গ্রামে তার পরিচিতজনের বাড়িতে তাকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সেই গ্রামের একজন লিনিয়া গ্রামের লোকজনদের কাছে এ খবর ফাঁস করে দেয়। লিনিয়া গ্রামের খুন হওয়া ব্যক্তির কৌমের লোকেরা একটা দল তৈরি করে সেই গ্রামে হানা দেয় ও খুনী ব্যক্তিকে আটক করে লিনিয়া-য় ফেরত নিয়ে যায়। লিনিয়া-য় প্রত্যাবর্তনের পথে আপাতনি উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা হরি গ্রামের সেই আপাতনির বাড়িতে হাজির হয় আর ধরা পড়া ব্যক্তি আপাতনিটির উপর বিশ্বাসঘাতকতার দোষ আরোপ করে। আপাতনিটিকে 'মামা' বলে সম্বোধন করে ধরা পড়া ব্যক্তিটি অভিশাপ দেয় যে খুনের শাস্তিতে তাকে যদি মরতে হয়, তাহলে তার বিশ্বাসভঙ্গকারীরও মৃত্যু হবে।

পরের দিন লিনিয়া-য় খুনের বিচার করে নিশি-রা তাকে মেরে ফেলে। এই খবর হরি গ্রামে পৌঁছানোর পর আপাতনিটির মনে হয় যে মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি তাকে বিশ্বাসভঙ্গকারী হিসাবেই ঠাউরে থাকে তাহলে সেই আত্মা নিশ্চিতভাবেই তার উপর প্রতিশোধ নেবে। এই মিথ্যা দোষারোপ থেকে মুক্তি পেতে সমতল-নিকটস্থ গ্রামের মানুষদের প্রতি রাগে সে আপাতনিদের একটা ছোট দল তৈরি করে সেই গ্রামের উপর হামলা চালায়।

ঠিক কী হয়েছিল সেই হামলায় জানি না, তবে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল। তখন সেই গ্রামের মিসান (পার্বত্য মিরি)-রা সমতলের শাসক ব্রিটিশ-দের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করে আপাতনিদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য। ব্রিটিশ-রা তখন হালইয়াঙ ও মিসান (নিশি, পার্বত্য মিরি)-দের নিয়ে ও সেনা নিয়ে এই উপত্যকায় আসে ও আপাতনিদের সঙ্গে মিসান, হালইয়াঙ-দের বোঝাপড়ায় মধ্যস্থতাকারী হিসাবে হরি ও হঙ-এর মাঝে বীড়ী-র পাহাড়ের উপর এক সভা ডাকে। ব্রিটিশদের সঙ্গে আসা হালইয়াঙ-রা গ্রামের ঘর-ঘর থেকে ডিম, শুয়োর, মুরগি চুরি করছিল, তাই বহু আপাতনি সেই সভায় যায় নি। আপাতনিদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিল হাগে দোলইয়াঙ, তাস্সো গ্যায়ু, হাগে ইপো ও তাস্সো কানো, আর আপাতনিদের মুখপাত্র ছিল তাস্সো মুর্চি যে পুরোহিতদের বিশেষ শাল ও তামার বালা পড়ে গিয়েছিল। নিশি বা পার্বত্য মিরি-দের হাতে কত আপাতনি মারা গেছে বা প্রবঞ্চিত হয়েছে তা সেখানে তাস্সো মুর্চি কোট্টির (ছোট ছোট বাঁশের কাঠি যা গণনার জন্য ব্যবহার করা হয়) ব্যবহার করে গুনে দেখিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল যে সেই সংখ্যা সমতল-নিকটস্থ গ্রামে হানায় মৃতের সংখ্যার থেকে বেশি, তাই আপাতনিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাকচ হয়ে গিয়েছিল। কেবল হরি গ্রামকে একটা মিঠুন জরিমানা করা হয়েছিল, সেই মিঠুন ব্রিটিশদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মিঠুন নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে ব্রিটিশরা তা ফেরত দিয়ে গিয়েছিল।

(কথক– হরি গ্রামের ৭০ বছর বয়স্ক হাগে হীবা ও ৬৫ বছর বয়স্ক হাগে তাপা। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল।কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

দেখা যাক ব্রিটিশরাষ্ট্রের দলিল-দস্তাবেজ-য়ে এই ঘটনাকে কীভাবে দেখা হয়েছে।

১৮৯৬ সালের শেষদিকে উত্তর লখিমপুর-এর ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে একটা হত্যাকাণ্ডের খবর আসে, সে খবর তারা শিলং-য়ে তাদের উচ্চপদস্থদের কাছে পাঠায়। খবর অনুযায়ী, এক দল আপাতনী পাহাড় থেকে নেমে পোডু নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা চালিয়েছে। পোডু পার্বত্য মিরি জনজাতির লোক, যে ইনার লাইনের কাছের এক চা বাগানে শ্রমিক-যোগানদার বা লেবার-কনট্রাক্টর হিসাবে কাজ করত। দুজন পার্বত্য মিরি এই হানায় প্রাণ হারিয়েছে, আর চারজনকে আপাতনিরা তাদের সঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে, যাদের মধ্যে একজন আবার পথেই মারা গেছে।

১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আসাম রাইফেলস-এর ৩০০ সেনা ও তাদের অফিসাররা পাহাড়ে উঠতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে ছিল ৪০০জন মালবাহক ও ভৃত্যের এক বিশাল বাহিনী। পাহাড়ে উঠতে উঠতে বিভিন্ন জায়গায় সাময়িক ঘাঁটি তৈরি করে কিছু কিছু সেনা মোতায়েন করে যাওয়া হয়েছিল। আপাতনি উপত্যকায় পৌঁচেছিল ১২০ জন সেনা। অভিযানের কম্যান্ডিং অফিসার ছিল আর. বি. ম্যাককাবে। হঙ গ্রামে ঢোকার মুখে লম্বা

বর্শা হাতে একদল আপাতনি ক্রুদ্ধভাবে তাদের গ্রামে ঢুকতে মানা করে বলেছিল যে তারা তাদের গ্রামপ্রধানকে সেখানে ডেকে আনছে, সেখানেই যা কথা বলার আছে তারা বলুক। কিন্তু ম্যাককাবে তাদের নিষেধ অমান্য করে এগিয়ে গেলে তারা কোনও বাধা দেয় নি।

পরের দিন সকালে আলোচনা (ব্রিটিশদের ভাষায়, 'প্যালাভার') শুরু হয়, চলে টানা দুই দিন ধরে। এই আলোচনার একটি আলোকচিত্রও ব্রিটিশ দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে পাওয়া যায়। আলোকচিত্রটি এইরকম–

আলোকচিত্রটি ইংরেজ সার্জেন-লেফটেন্যান্ট লেভেনটন-এর তোলা। এখানে আপাতনিদের সঙ্গে ইংরেজ অফিসারদের আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। নিশি ও পার্বত্য মিরিদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত। ছবির আশেপাশের হাতে-লেখা চিহ্নগুলি খেয়াল করলে আরও কিছু সনাক্তকরণ করা যায়। ইংরেজ পলিটিকাল অফিসার ম্যাককাবে বসে আছেন, যেন বা কিছু লিখছেন। 'নোরি' ও 'রো' আরও দুই ইংরেজ অফিসার। 'সিঙ' ইংরেজ বাহিনীর কোনও হালইয়াঙ কর্মচারী। 'টেগু' নিশি বা মিরি-দের কেউ বোধহয়।

ব্রিটিশ দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় যে ম্যাককাবে বলছেন যে প্রশাসনিক পদে উত্তর-পূর্বে এর আগে ২০ বছরের অভিজ্ঞতায় এত ধৈর্যের পরীক্ষা আর কখনও তাঁকে দিতে হয় নি। আপাতনিদের প্রধান মুখপাত্র সমতলবর্তী মিরিদের গ্রামে তাঁদের হানা চালানোর ঘটনা স্বীকার করে নেন, তারপর তিনি বিস্তৃতভাবে মিরিদের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ ও অভিযোগের তালিকা পেশ করতে থাকেন। সেই অভিযোগের ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত করার জন্য মাটির উপর রাখা একটা লম্বা লাঠির উপর এক এক করে বাঁশের টুকরো বা কোট্টির রাখতে থাকেন। এক একটি কোট্টির এক একটি অভিযোগের জন্য, অভিযোগও বিবিধ— মিঠুন চুরি, ধার নিয়ে শোধ না করা, আপাতনি মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া। এরপর আপাতনি মুখপাত্র অভিযোগ করেন যে আপাতনিদের হানায় পোডু নামে যে মিরি মারা গেছে সে বহুদিন ধরে অনেক আপাতনিদের ঠকিয়ে আসছে। বহু আপাতননিকে সে চা-বাগানে কাজ করে রোজগারের কথা বলে সমতলে নিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে অনেক আপাতনির সেখানে দুর্ভোগে মৃত্যু ঘটেছে, অনেক আপাতনি হাড়-ভাঙা খেটেও কোনও পারিশ্রমিক না পেয়েই ফিরে এসেছে। এই বিস্তৃত অভিযোগ-পেশ-এর পর আপাতনি মুখপাত্র সমতলবর্তী গ্রামে হানায় বন্দি করে আনা ৩জনকে এবং পোডুর ঘর থেকে লুঠ করে আনা একটা বন্দুক ইংরেজ বাহিনীর কাছে ফেরত দেয়।

ম্যাককাবে বন্দি করে আনা আরও ১০জনকেও দাবি করেন এবং অন্য এক হানায় লুঠ করা আর একটি বন্দুকও ফেরত চান। আপাতনিরা সেই ১০জনের মধ্যে ৬জনকে মুক্ত করতে রাজি হয় ও ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনটে মিঠুন ও একটি মূল্যবান তিব্বতি ঘন্টা দিতেও রাজি হয়। তারপর আপাতনিরা আগন্তুক বাহিনীর সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে। ম্যাককাবে চিন্তা করেন যে আপাতনিদের দেওয়া মিঠুনগুলো তাঁদের কোনও কাজে আসবে না, তা শেষ অবধি তাঁদের সঙ্গে আসা নিশি মালবাহকদের ভোগে যাবে এবং নিশি মালবাহকদের উপর তিনি বিরক্তও ছিলেন, তাই তিনি মিঠুনগুলো আপাতনিদের আবার ফেরত দিয়ে দেন। তারপর ইংরেজ বাহিনী ফিরে আসে। ব্রিটিশ দলিলে এই ঘটনাকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে শৃঙ্খলারক্ষা ও ন্যায়বিচারপ্রতিষ্ঠার একটি সফল কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আপাতনি সমাজের রাজনৈতিক পরিসর: বুলিয়াঙ

১৮৯০-এর শেষভাগে প্রথম বাইরে থেকে যাওয়া পর্যবেক্ষক ক্রো-র দৃষ্টিতে আপাতনিদের সমাজকে যে অত্যন্ত 'সংঘবদ্ধ' মনে হয়েছিল, তা বোধহয় আপাতনি সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হল বুলিয়াঙ, যা এক বিশেষ ধরনের গ্রাম-পরিষদ। 'এ ফিলজফি ফর নেফা' বইতে (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৫৫) ভেরিয়ার এলউইন-ও বলেছেন যে আপাতনিরা অরুণাচল প্রদেশের (তৎকালীন নেফা-র) অন্যান্য জনজাতিদের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত চরিত্রের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে তাদের ঘন বুননের সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা ও গ্রামগুলোর পরস্পর-নিকটবর্তী অবস্থানের জন্য। ১৯৪৪ সালে সি ভন ফুরের-হাইমেনডর্ফ সরেজমিন দেখে আপাতনিদের বুলিয়াঙ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, এলউইন তাও বিশদে উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনা থেকে বুলিয়াঙ সম্পর্কে কী ধারণা পাওয়া যায় দেখা যাক।

হাইমেনডর্ফ বলেছিলেন, আপাতনিদের বিভিন্ন কৌমের প্রতিনিধি, সমষ্টিগতভাবে যারা গ্রামীণ প্রশাসন হিসাবে কাজ করে, তা হল বুলিয়াঙ। এই প্রতিনিধিদের বাছা হয় কী ভাবে ? ভূসম্পত্তি বেশি এমন কুলীন পরিবার থেকে এক বা দুজন সবসময় নির্বাচন করা হয়, কিন্তু তা ছাড়াও ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার নিরিখে প্রভাবশালীদেরও নির্বাচন করা হয়। বুলিয়াঙ তিন ধরনের— আখা বুলিয়াঙ, ইয়াপা বুলিয়াঙ ও আজাঙ বুলিয়াঙ। আখা বুলিয়াঙ হলেন বৃদ্ধজনেরা, বয়সভারে যাঁদের পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্মে গায়েগতরে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে তাঁদের কথাই শেষ কথা কারণ পরম্পরাগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁদের স্মৃতিতেই রক্ষিত। ইয়াপা বুলিয়াঙ হল মধ্যবয়স্করা, যারা গ্রামপরিষদের

সভায় নিয়মিত অংশ নেয়, যে কোনও বোঝাপড়া বা সিদ্ধান্তপ্রয়োগে নেতৃত্ব দেয় এবং সব বিষয় আখা বুলিয়াঙদের অবগতিতে আনা ও পরামর্শ নেওয়ার কাজ করে। আজাঙ বুলিয়াঙ হল তরুণরা, যাদের কাজ ইয়াপা বুলিয়াঙদের সহকারী হিসাবে কাজ করা, খবরাখবর বহন করা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়া। প্রত্যেক বুলিয়াঙ তার কৌম বা কৌম-সংঘের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে দায়বদ্ধ হলেও তারা সামগ্রিকভাবে পরম্পরাগত আইন ও ন্যায়পরতার আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। কারও কোনও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করা দস্তুর নয়, কেবলমাত্র যখন কোনও সংঘাত, বিবাদ বা কলহ বারোয়ারি পরিসরের বিষয় হয়ে উঠেছে, সমষ্টিগতভাবে যার বিধান করা উচিত, তখনই তারা হস্তক্ষেপ করে এবং আলোচনার মাধ্যমে বা প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করে। সমষ্টির স্বার্থে এই ভূমিকা পালনের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতিটি সামাজিক উৎসবের সময় তাদের বিভিন্ন উপহার, বিশেষ করে নিজেদের তৈরি সুরা ও মাংস, দেওয়া হয়।

হাইমেনডর্ফ মন্তব্য করেছিলেন যে এই ব্যবস্থা আদিবাসীদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করছে এবং তৎকালীন ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার (ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার)-এর কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন যে এই ব্যবস্থার প্রভাব বা প্রাধিকারকে খর্ব করে এমন কোনও পদক্ষেপ যেন না নেওয়া হয় কারণ তা আদিবাসীদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

মার্চ ১৯৪৫, ফুরের হাইমেনডর্ফ-এর তোলা আলোকচিত্র। আপাতনি উপত্যকায় তিনি প্রথম পৌঁছানর পর এই সমবেত আপাতনিরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।

হালইয়াঙদের আধিপত্য বিস্তার: ১৯৪৮ ও তার পর

বুলিয়াঙ-এর মাধ্যমে স্ব-প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রাধিকার রক্ষা করার এই যে পরামর্শ হাইমেনডর্ফ তাঁর লেখায় দিয়েছিলেন, বাস্তব কর্মে কিন্তু তিনি নিজেই তার বিপরীত প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটিয়েছিলেন। একজন আপাতনির স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরান যাক।

লালিঙ আর ইয়ালু (ফুরের-হাইমেনডর্ফ-কে এলাকার আদিবাসীরা লালিঙ বলত, আর তার স্ত্রী বেটি-কে ইয়ালু বলত) আমাদের উপত্যকায় আসার (১৯৪৪) পর থেকে হালইয়াঙরা আমাদের মধ্যের ঝগড়া-বিবাদে হস্তক্ষেপ করে বিচার করতে থাকে। তেমনই এক ঘটনায় হঙ গ্রামের বুলো কৌমের লোকেরা রেগে গিয়েছিল হালইয়াঙদের করা বিচারে হেরে গিয়ে। তারপর থেকে হঙ গ্রামের মানুষরা চাইত না যে হালইয়াঙরা তাদের ব্যাপারে নাক গলাক।

লালিঙ আর ইয়ালু প্রথমে থাকত হিজা-য়, তারপর ল্যিঙ পীসা-য়, আর তারপর পাপী-তে। যখন তারা পীসা-য় থাকতে লাগল, তখন তারা আমাদের বাধ্য করত তাদের মালপত্র বহন করার জন্য। এমনকি তাদের মাল বইতে অস্বীকার করেছে বলে আমাদের দুজন লোকের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ খাড়া করেছিল। সেই দুইজন হল তাস্সো তাসের আর হাগে তাতিঙ। সমতলের কিমিন থেকে জোরাম ও লাজি মাই হয়ে জিরো অবধি মাল বহন করতে হতো।

প্রথমে হালইয়াঙরা আমাদের মাল বইতে বাধ্য করল, তারপর হালইয়াঙরা আমাদের বিবাদের মীমাংসা করতে লাগল। তারা আসার আগে আমরা নিজেরাই নিজেদের বিবাদের মীমাংসা করতাম। লালিঙ (হাইমেনডর্ফ) আসার পর কেউ কেউ তাদের বিবাদে মধ্যস্থতা করার জন্য লালিঙ (হাইমেনডর্ফ), মেনজি বড়ুয়া (ভারত সরকারের অফিসার) বা হাজারিকা সাব (ভারত সরকারের অসমিয়া অফিসার)-এর কাছে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে আলাপ-আলোচনায় বিবাদ মেটাতে তারা সাহায্য পাবে। কিন্তু এই হালইয়াঙরা নিজেদের জোর খাটাতে শুরু করে আর আমাদের মধ্য থেকে লোকজনকে ধরে জেলে পাঠাতে থাকে। আমরা তাদের এই বিচারের নিয়মকানুন মানতে রাজি ছিলাম না, আমরা জেলে পাঠানোর রীতি চাইছিলাম না, আমরা আমাদের রীতি অনুযায়িই চলতে চাইছিলাম। কিন্তু হালইয়াঙরা তাদের রীতি না মানার জন্য কিছু বুলইয়াঙদের অবধি জেলে পাঠাতে শুরু করে। আমাদের বাবা ও দাদু-রা বলতে থাকে যে আমাদের বুলিয়াঙদের মাধ্যমেই আমাদের বিবাদ মেটানো উচিত। এরপর একটা মিঠুন আর এক তরুণীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক সংক্রান্ত বিবাদে বুলইয়াঙদের বিচার নাকচ করার জন্য হালইয়াঙরা হস্তক্ষেপ করে। এসব দেখে কিছুজন বলতে শুরু করল, "এ ভালো হচ্ছে না। এইসব হালইয়াঙদের এখানে আসতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত এইসব বাইরের লোকদের তাড়িয়ে দেওয়া।" প্রথমে যারা এমন বলতে শুরু করেছিল তারা হল হঙ-এর তাপি কোজিঙ, কালুঙ-এর নাকো গ্যাতি ও সুবু খোডা এবং হরি-র তাস্সো তালু। কিছুদিনের মধ্যে গোটা উপত্যকার লোকজনই বলতে শুরু করল, "এইসব হালইয়াঙদের এখানে আসা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের বিবাদের বিষয় আমরা আর ওদের সঙ্গে আলোচনা করব না, নিজেদের বিবাদ আমরা নিজেরাই মেটাব। আর আমরা ওদের আক্রমণ করব।"

হালইয়াঙ-রা পাপী-তে একটা ছাউনি তৈরি করেছিল তাদের মালপত্র মজুদ করার জন্য। আপাতনিরা কুরে-তে

হালইয়াঙদের সরকারের আউটপোস্ট আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই পাপী-র হালইয়াঙদের ছাউনিও জ্বালিয়ে দেয়। কুরে-র আউটপোস্টের উপর আক্রমণ করতে গেলে হাজারিকা সাব এবং তার সেপাইরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তিনজন আপাতনি— তাস্সো পিলইয়াঙ, ডুয়ু কোলইয়াঙ আর তাস্সো কোজিঙ— গুলিবিদ্ধ হয়। তারা মারা যায়। আমরা প্রায় কিছুই করতে পারি নি। কেবল দুসু রিকু হাজারিকা সাবের গায়ে এক বর্শার ঘা লাগাতে পেরেছিল। তিনজন গুলিতে মারা যাওয়ার পর সবাই ছুটতে ছুটতে গ্রামে পালিয়ে এসেছিল।

কুরের উপর আক্রমণের চারদিন পর মেনজি বড়ুয়া আটজন সশস্ত্র সেপাইয়ের দল নিয়ে হরি গ্রামে এল। তারা হাওয়ায় দুম দুম করে গুলি ছুঁড়ল, তারপর হাঁক দিয়ে 'পি আই'-দের (পি আই হল পলিটিকাল ইন্টারপ্রেটর-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আদিবাসীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ভারত সরকার ১৯৪৫-এর পর এইভাবে চিহ্নিত করতে থাকে সরকারের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক গড়ে তোলার সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য।) বেরিয়ে আসতে বলে। সেই সময় হরি-র পি আই ছিল দুসু তাইয়ু আর হাগে ডোলে। তারা বেরিয়ে এল। হাগে ডোলে-কে তার ফসলের ঘরের পাশেই গুলি করে খুন করল সেপাইরা। আর দুসু তাইয়ু-কে সঙ্গে সঙ্গে বন্দি করল তাদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মেনজি বড়ুয়া বন্দিকে নিয়ে পুরানো জিরো-য় ভারত সরকারের ক্যাম্পে চলে গেল। সেইখান থেকে সে হুকুম দিল হারি গ্রামকে আগুনে পুড়িয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হবে। মেনজি বড়ুয়ার সেপাইরা হারি গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিল আর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। হাগে জারবো ছুটে পালাচ্ছিল, গুলি তখন তার পিঠে লাগে আর পেট ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। গ্রামের পিছনে বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় লাণ্ডি হালে গুলিবিদ্ধ হয়। হাগে খোদা-কে গুলি করে মারা হয়। (এই সময় প্রায় ৪,০০০ আপাতনি হালইয়াঙদের সন্ত্রাস থেকে প্রাণ বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তারপরও বহুদিন নিজেদের গ্রামে না ফিরে অন্যান্য আদিবাসী জনজাতিদের গ্রামে আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়।)

এর পর আমরা ভারত সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করি, ভারত সরকারের সব নির্দেশ পালন করতে থাকি— মাল বহন করা থেকে সমস্ত কিছু। কুরে-তে মেনজি বড়ুয়া ভারত সরকারের অফিস বসাল রায় সাব, গেণ্ডা সাব আর কয়েকজন নিশি 'পি আই'-কে নিয়ে। এই নিশি পি আই-রা ছিল কুপ তানিয়া (বা কোপ তেমি, যে হাইমেনডর্ফের অধীনে কাজ করতে শুরু করেছিল, তারপর ভারত সরকারের বিশ্বস্তজন হয়ে ওঠে), নিক কোপে আর টাবা টাটু। ভারত সরকারের সাব (সাহেব)-রা আপাতনিদের গাঁয়ে গাঁয়ে তাদের পছন্দমতো 'গাঁওবুড়ো' ঠিক করে দিতে থাকে, যেমন হাগে ডোলইয়াঙ, গ্যাতি টাডু, মুদান টাকের, পাদি লালইয়াঙ আর টাকে টাণ্ড। এই ঠিক করে দেওয়া গাঁওবুড়োরা সব সরকারের সঙ্গে 'সহযোগিতা' করার কথা দিল, এমনকি তারা কুরের উপর আক্রমণের জন্য ক্ষমাভিক্ষাও করল। তারা এসব করেছিল কারণ তারা চায় নি যে আপাতনিদের উপর আরও আক্রমণ নেমে আসুক আর আরও আপাতনিকে প্রাণ দিতে হোক। সরকারের সঙ্গে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ তারা সরকারকে ভেট দিয়েছিল একটা বহুমূল্য ধাতুর ঘন্টা, একটা পিতলের থালা, কিছু মিঠুন আর গরু।

এর পর পরই পুরানো জিরো-র কাছে পাহাড়ের উপর ভারত সরকারের নতুন বাড়ি তৈরি হল। আমাদেরকেই খাটতে হল সেই ইমারত তৈরির কাজে মালপত্র বওয়া ও জোগান দেওয়ার কাজে। আমরা যখন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতাম, বন্দুকধারী সেনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অপমান করে বলত, "ফালতু অকর্মা লোকজন! কোনও কাজই করতে পারে না!" কত বোঝা যে আমাদের বইতে হতো! যদি আমাদের কেউ তা করতে অস্বীকার করত তবে তাকে জেলে পাঠান হতো। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে আমাদের ভারী বোঝা বইতে হতো— এখান থেকে কিমিন, কিমিন থেকে এখানে, এখান থেকে পারসিং, তামেন-এর কাছে খেমিও হয়ে দাপোরিজো অবধি। না করলেই জেল! আমাদের ১০ থেকে ২০জনকে না করার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল।

(কথক– হরি গ্রামের হাগে হীবা। ১৯৪৮-এ তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১৩৪- ১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল।কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

১৯৪৮ এখনও আপাতনিদের কাছে সেই সময় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে যখন হালইয়াঙ-রা আপাতনি উপত্যকা দখল করল, বা যখন আপাতনিরা তাদের স্বাধীনতা খোয়াল হালইয়াঙ-দের কাছে। ভারত যখন কয়েক শতক ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পদানত ছিল, আপাতনিরা তখন ছিল স্বাধীন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ১৮৯৭ সালে প্রথম মোলাকাত হলেও, তখন তাদের স্বাধীনতা হারাতে হয় নি, সমতলের সরকার তাদের উপত্যকায় আধিপত্য কায়েম করায় তেমন মনোযোগ দেয় নি। ১৯৪০-এর দশকে সমতলের সরকার সেই মনোযোগ দিতে শুরু করে, তাদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এই উপত্যকায় বিস্তৃত করতে তাদের প্রতিনিধি (যার মধ্যে হাইমেনডর্ফের মতো নৃতাত্ত্বিকও পড়েন) পাঠান, সশস্ত্র বাহিনীর (আসাম রাইফেলস-এর) ঘাঁটি তৈরি করা ও পি আই বা পলিটিকাল ইন্টারপ্রেটর-এর নামে আদিবাসীদের মধ্য থেকে একটা বশংবদ অংশ তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়। আদিবাসীদের বৈশিষ্টপূর্ণ স্বশাসনের ব্যবস্থাকে দুর্বল করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তদনুসারী আইন ও দণ্ডব্যবস্থা লাগু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হাইমেনডর্ফ ও সরকারি অফিসারদের দ্বারা আপাতনিদের বুলিয়াঙ-দের প্রভাব ও প্রাধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা এই প্রক্রিয়ারই অংশ। আর এই

প্রক্রিয়ারই একটি বিস্ফোরক মুহূর্ত ১৯৪৮ সাল, যখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বল্গামুক্ত করে দিয়ে আপাতনিদের স্বাধীনতা হরণ করা হল। ভারতে রাষ্ট্রে তখন ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে স্বাধীন ভারতের সরকারের হাতে আর সেই রাষ্ট্রই গিলে নিল আপাতনিদের স্বাধীনতা।

১৯৫৪ সালে পার্বত্য অরুণাচলের প্রশাসন চালাতে ভারত সরকার যখন নেফা (নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি) গঠন করল, তখন তার সুবানসিরি অঞ্চলের 'পলিটিকাল অফিসার'-এর প্রধান দপ্তর বসানো হলো আপাতনি উপত্যকার উত্তর প্রান্তে পুরানো জিরোয় এক পাহাড়ের মাথায়। মালপত্র বহনের সমস্যা সমাধান করতে ১৯৫০ সালেই জিরোতে তৈরি করা হয়েছিল বিমানবন্দর। পলিটিকাল অফিসার তাঁর আমলাবর্গ ও আসাম রাইফেলস-এর সশস্ত্র জওয়ানের দল নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। পাহাড়ের পাদদেশে বাজার ও নতুন লোকবসতি গড়ে উঠল। সরকারি (অর্থাৎ সরকারের বেছে দেওয়া) গাঁওবুড়ো (তাদের পোষাকও সরকারের ঠিক করে দেওয়া এক ধরনের লাল 'ইউনিফর্ম', বুলইয়াঙ-দের পরম্পরাগত পোষাক নয়) গ্রাম-পরিষদগুলোর মাথায় বসিয়ে গ্রাম-পরিষদগুলোর চরিত্রই বদলে দেওয়া হল। গ্রাম-পরিষদের আলোচনা ও বিচার হতে হবে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সেখানে অগ্রাধিকার পাবে, আদিবাসীদের নিজস্ব পরম্পরা-রীতি-ন্যায়পরতা নয়।

হালইয়াঙদের আধিপত্য বিস্তার আরও তেজি হল ১৯৬২-র পর। ১৯৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধের পর 'চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার' আবেগ-প্লাবনের মাথায় চড়ে নেফার পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে ভারতরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে বিপুল পরিমাণে মোতায়েন করা শুরু হল। আপাতনি উপত্যকাতেও সেনার 'ক্যাম্প' তৈরি হল। এক দশকের মধ্যে সেনা ও তাদের ঘিরে বাইরে থেকে আসা আমলা, প্রশাসক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী (যাদের সঙ্গে আপাতনিদের জীবনরীতি, সংস্কৃতি বা অর্থনীতি-র কোনও যোগ নেই, পরিচিতিও নেই)-দের কেন্দ্র করে আপাতনি উপত্যকার দক্ষিণে জঙ্গল কেটে নতুন গঞ্জ বা ছোট শহর গজিয়ে উঠল। তার নাম হাপোলি। কয়েক বছরের মধ্যে হাপোলি-র সঙ্গে আসাম-এর সড়ক যোগাযোগ তৈরি হল, ভারতরাষ্ট্রের সবরকমের প্রশাসনিক দপ্তরের শাখাদপ্তর হাপোলিতে খোলা হল। ব্যাঙ্ক, বাজার তৈরি হল। গোটা উপত্যকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রামগুলো থেকে সরে এসে হাপোলিতে কেন্দ্রীভুত হল। আপাতনিদের বৈশিষ্টপূর্ণ রাজনৈতিক পরিসর বুলইয়াঙ-প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে স্বশাসিত গ্রামপরিষদ-এর মৃত্যু এর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হল। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসাবে অঞ্চলের যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে শেষ কথা বলার অধিকারী এখন সরকার-নিযুক্ত আমলা ডি সি (ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার), লোকপ্রজ্ঞার ভাণ্ডারী গ্রামের বৃদ্ধদের এখন আর এ বিষয়ে কোনও অধিকার নেই, অন্যান্য গ্রামবাসীদেরও নেই। এরপর ১৯৮৭ সালে নেফা তুলে দিয়ে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য গঠনের পর রাজ্য জুড়ে যে পার্টি-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার আরও একচেটিয়াভাবে কেন্দ্রীভূত ভারতরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে গচ্ছিত হয়েছে। এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর প্রশ্রয়ে রাজ্য জুড়ে গড়ে উঠেছে এক মুষ্টিমেয় অভিজাতবর্গ, কেন্দ্রীভূত শাসন বাস্তবায়িত করায় সহযোগিতার বিনিময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার দর্পের প্রতিফলিত ছায়া গায়ে মেখে যারা ক্ষমতাদর্পী, আদিবাসীদের সহযোগিতামূলক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ব্যক্তিগত সম্পদ ও প্রভাব বৃদ্ধিতে মনোযোগী।

এর ফল কী হল দেখা যাক।

ভাষা ও সংস্কৃতি: পাড় ভাঙার শব্দ

সেনাবাহিনীর বড়সড় উপস্থিতির হাত ধরে আপাতনি উপত্যকায় জায়গা করে নিতে শুরু করে হিন্দি ভাষা। ২০০০–২০০৮ সময়পর্যায়ে আপাতনিদের মুখের গল্প সংগ্রহরত স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নকে অনেক আপাতনি বলেছিলেন যে ১৯৬০-এর দশকে সেনাদের কাছ থেকেই তাঁদের হিন্দি শেখার শুরু। এছাড়াও হালইয়াঙদের আধিপত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়েছিল স্কুল। প্রথম স্কুল চালু হয় ১৯৪৮ সালেই। তারপর প্রতিটা গ্রামেই একটা করে স্কুল খোলা হয়। হাপোলি গড়ে ওঠার পর সেখানে গড়ে ওঠে একটি হায়ার-সেকেন্ডারি ও একটি হাইস্কুল। এরপর সরকারি স্কুল ছাড়াও ২১টি বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন ও অন্যান্য অ-সরকারি সংগঠনের উদ্যোগে। ২০০৪ সালে একটি খ্রিস্টান কলেজও চালু হয়। এই সমস্ত স্কুলের কোনওটাতেই আপাতনি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নেওয়া হয় নি। নেফার পর্যায়ে (১৯৫৪–১৯৭২) সমস্ত স্তরেই অসমিয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছিল, সেকেন্ডারি স্তর থেকে ইংরেজি শেখান হতো। ১৯৭২-এর পর থেকে শিক্ষামাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকেই প্রাধান্য দেওয়ার নীতি সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে, যদিও পাশাপাশি হিন্দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নেফার আমলে উপজাতিদের ভাষায় কিছু পাঠ্যবই লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নেফা-প্রশাসনের পক্ষ থেকে, কিছু পাঠ্যবই লেখাও হয়েছিল, কিন্তু সে সময়েও স্কুলে তা খুব চালু হয় নি, আর আজ তো তাদের আর দেখাই মেলে না।

আপাতনি ভাষা কথ্য ভাষা, এক লেখ্য রূপ ছিল না। ১৯৭০-এর দশক অবধি আপাতনিদের সমাজে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—জাতির ইতিহাস, ন্যায়পরতার আদর্শ ও বিধি, জমি-মালিকানার বিবরণী, কৌম সম্পর্কের বিবরণী, কৃষিকাজ বা বস্ত্রবয়নের প্রকৌশল, নদী-গাছ-জঙ্গল সম্পর্কে খুঁটিনাটি, ঋণ ও আদান-প্রদান, হানা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, পড়শি উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক—আপাতনি ভাষায় শ্রুতি হিসাবে বয়স্কদের স্মৃতিতে জমা থাকত আর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-প্রাত্যহিকতার মধ্য দিয়ে কমবয়সীদের মধ্যে বাহিত হতো। সংখ্যা গোনার জন্য অঙ্ক চালু ছিল, দৃশ্যত তা প্রকাশ করার জন্য ছোট ছোট বাঁশের ফালি (কোট্টির) ব্যবহার করা হতো। এটাই ছিল লোকশিক্ষার পরিসর।

বাঁশের ফালি (কোট্টির) দিয়ে আপাতনিরা হিসাবের কাজ করছে।
আলোকচিত্রটি ১৯৪৭ সালে আপাতনি উপত্যকায় উরসুলা বেটস-এর তোলা।

হালইয়াঙদের চালু করা স্কুল-ব্যবস্থা কেবল যে আপাতনি ভাষাকেই তুচ্ছার্থে এড়িয়ে গেল তা নয়, তা এই গোটা লোকশিক্ষার পরিসরটাকেই মূল্যহীন বা ফালতু বলে ঘোষণা করল। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-নিয়ন্ত্রক সংস্থা নির্দেশিত পাঠক্রম ও পাঠ্যবস্তু গলাধঃকরণ করাই শিক্ষার একমাত্র সংজ্ঞা হিসাবে উপস্থাপিত হল। হরি গ্রামের হাগে হীবা-র কথনে আমরা আগে দেখেছি কীভাবে সেনারা আপাতনিদের 'অকর্মা ফালতু' লোক হিসাবে গালিগালাজ করত, এখন হালইয়াঙদের স্কুলগুলো আপাতনিদের গোটা ভাষা-সংস্কৃতির পরিসরটাকেই 'অসভ্য লোকেদের অন্ধ বিশ্বাস' হিসাবে ফালতু বলে ঘোষণা করল।

১৯৪৮-এ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রবল দাবদাহে ঝলসে গিয়ে আপাতনিরা আপাতত আত্মরক্ষার্থে প্রবলপরাক্রমী রাষ্ট্রের কথা মেনে চলতে মনস্থ করেছিল, তাই রাষ্ট্র যখন স্কুল খুলে শিশুদের ডেকে পাঠাল, তখন সে স্কুলের আঙিনায় আপাতনি শিশুরা হাজির হল। নিজেদের পোষাক থেকে শুরু করে নিজেদের ভাষা ও বাচনভঙ্গি অবধি সমস্ত কিছু নিয়েই তাদের কুঁকড়ে থাকতে হয়, বুঝে নিতে হয় যে হালইয়াঙদের অনুকরণ করে হালইয়াঙদের নিয়ে আসা ভাষা-সংস্কৃতি রপ্ত করতে না পারলে শিক্ষিত হওয়া যাবে না।

ওদিকে হাপোলি-র পত্তন হয়ে সেখানে হালইয়াঙদের প্রশাসন ও পণ্য-পুঁজি-র কারবার গেঁড়ে বসেছে। লিখিত আবেদন-নিবেদন দলিল-দস্তাবেজের সেই নতুন ব্যবস্থা উপত্যকার উপর তার কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। তার সামনে খাড়া হতে গেলেও হিন্দি/ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও হালইয়াঙদের আদবকায়দা রপ্ত করা বাধ্যতামূলক। হালইয়াঙদের স্কুল ছাড়া তা হবে কোথায় ?

হালইয়াঙদের স্কুল থেকে তাই ইংরেজি ও হিন্দি জানা হালইয়াঙদের আদবকায়দায় রপ্ত আপাতনি বেরতে লাগল যারা আপাতনি ভাষা, লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতির পরিসর থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিচ্ছিন্ন। ২০০১ সালের ভারত-সরকারের আদমশুমারি দেখাচ্ছে যে আপাতনিদের মধ্যে ৭১% সাক্ষর, অর্থাৎ হিন্দি বা ইংরেজি লিখতে-পড়তে জানে। স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন আপাতনি মুখের গল্প সংগ্রহ করার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে ২০০৮ সালে ৩০ বছরের নীচে প্রায় সমস্ত আপাতনিই সাক্ষর, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হিন্দি বলা-লেখায় সাবলীল, অনেকে ইংরেজিতেও; ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রও কিছুজন পড়ে, ই-মেল করে ইংরেজিতে, একজন ইংরেজিতে ব্লগ লেখাও শুরু করেছে।

আপাতনি ভাষা আপাতনি উপত্যকার গ্রামগুলোয় গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘরের মধ্যের ভাষা, লাপাঙ-এ আচার-অনুষ্ঠানের ভাষা ও পথে-ঘাটে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা হিসাবে চালু আছে। কিন্তু আপাতনি ভাষার শ্রুতি (আপাতনি ভাষায় যাকে বলে মিজি-মিগুঙ) তরুণ প্রজন্ম আর শিখছে না, বৃদ্ধদের স্মৃতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা আর বাহিত হচ্ছে না।

রোমান হরফে আপাতনি লেখার চল হয়েছে আপাতনিদের বাৎসরিক উৎসবগুলোর সময় হিসাবপত্র লেখার কাজে। কিন্তু আপাতনি ভাষার সুসংবদ্ধ একটা লেখ্য রূপ গড়ে তোলার চেষ্টা কোনওপক্ষেই নেই। কিছু বছর আগে কয়েকজন উৎসাহী ভাষাপ্রেমী 'তানি' নামে আপাতনি ভাষার একটি নিজস্ব লিপি তৈরি করে প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সরকার-প্রশাসন বা 'শিক্ষিতজন' কারও কাছ থেকেই তাঁরা কোনও সহায়তা পান নি, ফলে সেই চেষ্টা দানা বাঁধতে পারে নি।

আপাতনিদের 'ভারতীয়করণ' (বা 'হালইয়াঙ-করণ')-এর আর একটা প্রবল প্রবাহ বইছে ধর্মান্তরকরণের মধ্য দিয়ে। সেই দিকটা এবার দেখা যাক।

বস্তুজগতের উৎপত্তি, প্রাণের উৎপত্তি ও মানুষের উৎপত্তির অতিকথা অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বের অতিকথার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আত্মা ও আদি পূর্বপুরুষদের নিয়ে গঠিত 'আত্মার জগৎ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সামূহিক মঙ্গলের উপায় সেই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান আপাতনিদের মধ্যে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। গ্রামের লাপাঙে শ্রুতি-বাহিত মিজি কথনের সঙ্গে সঙ্গে উপহার আদান-প্রদান ও ত্যাগস্বীকারের নানা উপাচারের মধ্যে এর মূর্ত রূপ। সহযোগিতামূলক যৌথজীবনের বাঁধুনি হিসাবে কাজ করা এই লোকাচারের বুননই আপাতনিদের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎ। এই বিশ্বাসের জগতের উপর আক্রমণ হানল হালইয়াঙ ধর্মপ্রচারকরা।

১৯৮০-র দশকে আপাতনি উপত্যকায় প্রথম খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক (নাগাল্যান্ডে ঘাঁটি গাড়া ইভানজেলিকাল ব্যাপটিস্ট-দের মধ্য থেকে) এলেও ১৯৯০-এর দশকেই খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার তাৎপর্যপূর্ণ চেহারা নিতে থাকে আসাম থেকে আসা রোমান ক্যাথলিক প্রচারকদের হাত ধরে। হাপোলি ও পুরানো জিরো-য় বড়সড় গির্জা বাড়ি গড়ে ওঠে, মিশনারি স্কুল গড়ে ওঠে— 'আধুনিক' ইংরেজি শিক্ষা ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করার আকর্ষণে আপাতনিদের খ্রিস্টান ধর্মের দিকে টানার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আপাতনিদের গ্রামগুলোর কাছেও বাঁশ দিয়ে তৈরি প্রার্থনাকক্ষ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, যদিও ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা একাধিকবার তা ভেঙে দেয়। ২০০৩ সালে শেষ অবধি দুটো ছোট কাঠের গির্জাগৃহ দুটি গ্রামের প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয় আর তার পরের বছর ২০০৪ সালে একটি গ্রামের কাছে খ্রিস্টান কলেজ চালু হয়। এই ২০০৪ সালেই গির্জাগুলো থেকে গোটা উপত্যকা জুড়ে কয়েক হাজার ঝকঝকে দামি কাগজে ছাপা রোমান হরফে আপাতনি ভাষায় লেখা একটা প্রচারপুস্তিকা বিনামূল্যে

ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। পুস্তিকাটিতে তীব্রভাষায় আপাতনি ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচারকে 'অন্ধ-কুসংস্কারগ্রস্ত তন্ত্র-মন্ত্র' হিসাবে বিদ্রূপ-ব্যাঙ্গ করা হয় ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। এই নিয়ে আপাতনিদের মধ্যে ক্ষোভ ফেটে পড়ে, বেশ কিছু জায়গায় ওই প্রচারপুস্তিকা পোড়ানো হয়।

কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম ইতিমধ্যেই উপত্যকায় তার অবস্থান পাকা করে নিয়েছে। ১৯৭৮ সালে যেখানে হাইমেনডর্ফের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী উপত্যকায় খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মের কোনও প্রসার ছিল না, সেখানে ২০০৮ সালে ৩০,০০০ আপাতনির মধ্যে অন্তত ৪,০০০, অর্থাৎ ১৫% খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে, এবং সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান। এই খ্রিস্টানি আপাতনিদের বেশিরভাগ আপাতনি সমাজের সামাজিক উৎসবগুলোয় অংশ নেয় না, উপহার-বিনিময়ের আচারে অংশ নেয় না, বাকি আপাতনিদের 'অশিক্ষিত/ অল্পশিক্ষিত পশ্চাৎপদ' হিসাবে নিচু চোখে দেখে। আপাতনিদের পরম্পরাগত সহযোগিতামূলক সমাজবন্ধন ছিঁড়ে তারা আত্মউন্নতির পথে ছুটছে।

ইতিমধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রচারকরাও তাদের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। ১৯৬২-তে হপোলির সেনা-শিবির-এর মধ্যে প্রথম হিন্দু মন্দির স্থাপন হয়েছিল, আপাতনিদের সঙ্গে তার কোনও যোগ তখন তৈরি হয় নি। হিন্দুত্ব-প্রসারকদের কাজকর্ম নির্ধারক মাত্রা ধারণ করেছে ১৯৮০-র দশকের শেষভাগ থেকে। ১৯৮৮-তে উপত্যকার প্রথম বারোয়ারি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা, ক্রমশঃ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির সংখ্যা বাড়ানো, ২০০১-এ আরো দুটি মন্দির তৈরি ও হিন্দু সংগঠন (যেমন, বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন) পরিচালিত স্কুল চালু হওয়া— এর মধ্য দিয়ে হিন্দুত্বচর্চা ক্রমশঃ তাৎপর্যপূর্ণ আকার নিতে থাকে। এর কয়েক বছর পরে আপাতনি উপত্যকার সংলগ্ন বনাঞ্চলে একটা পুরানো বড় পাথরের মধ্যে 'শিবলিঙ্গ আবিষ্কার' করেন হিন্দুত্ব-প্রসারকরা এবং অচিরেই সেই জায়গাটিকে হিন্দুদের একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেন। আসাম থেকে আসা তীর্থযাত্রীর ঢলের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশতে থাকে আপাতনিরাও। এর পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্মপ্রসারকদের বিরুদ্ধে আপাতনিদের দানা বাঁধতে থাকা ক্ষোভের সঙ্গে সহমর্মিতা দেখিয়ে হিন্দুত্ব-প্রসারকরা দাবি করতে থাকেন যে আপাতনিদের ধর্ম আসলে হিন্দু ধর্মেরই অংশ। তাঁদের দাবি যে বৈদিক আমলের নানা আচারের মধ্যেই আপাতনিদের আচারের উৎপত্তি বলে আপাতনিরা হিন্দুদেরই একটি ভাগ, যদিও হিন্দুদের অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা পেছিয়ে-পড়া অবস্থায় রয়ে গেছে; আপাতনিদের বাকি হিন্দুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই হিন্দি-হিন্দু জাতীয়তাবাদের মান্য ধাঁচা অনুসরণ করে আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। এই হিন্দুত্ব-প্রসারকদের পিছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণা আজ বিপুল। তাই আপাতনি ধর্মবিশ্বাসের জগতকে গলিয়ে হিন্দুত্বের মান্য ছাঁচে ঢালাই করার কাজ এখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

পরম্পরাগত ধর্মীয় বিশ্বাসের জগতের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিরোধের একটা প্রচেষ্টা হিসাবে আপাতনিদের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে একটা নতুন ধর্মাচার, যার নাম দোন্যি-পোলো। দোন্যি-পোলো ধর্মকে সামাজিক যৌথতার পরিসরে আচরণীয় জীবনাচার থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তি-পরিসরে আচরণীয় আচারে পরিণত করছে, পরম্পরাগত ধর্মের কিছু চিহ্নকে বজায় রেখে। দোন্যি মানে সূর্য আর পোলো মানে চাঁদ। গির্জা বা মন্দিরের আদলে একটা উপাসনাঘর তৈরি করে, সেখানে সূর্য-চাঁদের ছবি রাখা হয়, সঙ্গে মিঠুনের হাড় বা খুলির মতো কিছু পুরানো ঐতিহ্যের চিহ্ন রাখা হয় এবং উপাসকরা সেখানে জড়ো হয়ে বৃন্দগানের আদলে সূর্য-চাঁদ ও অন্যান্য আত্মার জগতের শক্তির কাছে প্রার্থনা করে। হিন্দু মন্দিরে পুজো দেওয়া ও খ্রিস্টান গির্জায় বৃন্দগানের প্রভাব এখানে দেখা যায়। ২০০৪ সালে আপাতনি উপত্যকার গ্রামে প্রথম দোন্যি-পোলো ঘর শুরু হয়, ২০০৭ সালে আরও তিনটি গ্রামে তেমন ঘর তৈরি হয়। দোন্যি-পোলো ক্রমশ জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুত্ব-প্রসারকরাও দোন্যি-পোলোকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। হিন্দু গায়ত্রীমন্ত্র স্তবের সঙ্গে দোন্যি-পোলো উপাসনা সমার্থক বলে তাঁরা দোন্যি-পোলো-কে হিন্দু ধর্মে প্রবেশিকা হিসাবে হাজির করতে চাইছেন।

আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে ভারতীয়ত্বের এক মান্য সমরূপতায় ঢালাই করার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে আদিবাসীদের একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে, যার নাম 'ইনডিজেনাস ফেথ অ্যান্ড কালচার সোসাইটি', আপাতনি উপত্যকাতেও তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। ২০০১ সালে পুরানো জিরো-তে তাদের মারা দুটো পোস্টার এইরকম—

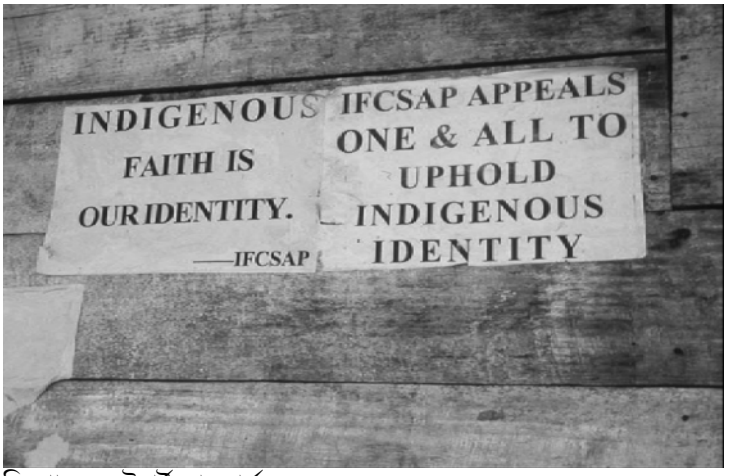

চিত্রগ্রাহক– স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন

সংগঠনটির নাম ইংরেজি ভাষায়, তার পোস্টারের ভাষাও ইংরেজি, অথচ এই ইংরেজি ভাষাই তো আদিবাসী ভাষাদের সাপেক্ষে ঘাতক ভাষা হিসাবে কাজ করছে— আদিবাসীদের ভাষাগুলো থেকে নতুন প্রজন্মের বাচকদের সরণ ঘটছে তো প্রধানত এই ইংরেজি ভাষাতেই!

অভিধান-পোড়ানোর এক ঘটনা ও সমাজদেহের ফাটল

'আপাতনি কালচার অ্যান্ড লিটারারি সোসাইটি' নামে হাপোলির একটি সংস্থা একটি আপাতনি-ইংরেজি অভিধান (রোমান লিপিতে) প্রকাশিত করে ২০০১-এর জুলাই মাসে। তা আপাতনি উপত্যকার বিভিন্ন স্কুলে ও কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই অভিধানকে

ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। হাপোলির সমাধিক্ষেত্রের কাছে এই অভিধানের মুদ্রিত সংস্করণের বেশিরভাগ জড়ো করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিধানের প্রস্তুতকারকরা এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুমকি দেয়। বিক্ষোভকারীরা পাল্টা দাবি করে যে অভিধান-প্রস্তুতকারকদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং অভিধান ফিরিয়ে নিতে হবে।

কী নিয়ে এত বিরোধ ? বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি শব্দের অভিধান-প্রদত্ত অর্থ। শব্দদুটি হলো গ্যতী ও গ্যচি— আপাতনি সমাজে দুটি কৌমের নাম। কোজিঙ নামের এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত কৌম হল গ্যচি, আর পুসাঙ নামের এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত কৌম হল গ্যচি। অভিধানে এই দুটি শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে এইরকম:

গ্যচি– পিপল অফ লোয়ার কাস্ট

গ্যতী– পিপল অফ আপার কাস্ট

অর্থাৎ, হিন্দুসমাজের জাতপাতের ভাগাভাগিকে আপাতনি সমাজের কৌমব্যবস্থার উপর আরোপ করে গ্যচি কৌমকে নিচুজাত ও গ্যতী কৌমকে উঁচুজাত বলে হাজির করা হয়েছে। অভিধানের রচয়িতারা গ্যতী কৌমের ও বিক্ষোভকারীরা গ্যচি কৌমের। অভিধান ঘিরে আরও কিছু অভিযোগ (যেমন, তাতে আপাতনিদের ধর্মীয় আচারের বহু শব্দ ঠাঁই পায় নি, গ্রামের মানুষদের ভাষা ঠাঁই পায় নি) উঠলেও, গ্যচি-গ্যতী প্রশ্নেই ঝড় ওঠে। আড়াআড়ি দুই পক্ষে বিভাজন তৈরি হয়, দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থান থেকে অপরপক্ষকে আক্রমণ করা, সভা-সমিতি করে নিজেদের পক্ষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা জোগাড় করার চেষ্টা চালাতে থাকে। সরকারি প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিকবার সমঝোতার বৈঠক ডাকা হয়। এ সবের মধ্যে ২০০৪ সালের গ্রীষ্মে একদল গ্যতী (পূর্বের অভিধান-রচয়িতাদের থেকে এঁরা আলাদা) একটি দ্বিতীয় আপাতনি-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ করে। সেই অভিধানে উঁচু-নিচু বিভাজনকে আরও প্রকট করে নিয়ে আসা হয়, সেখানে লেখা হয়:

গ্যচি– অরিজিনাল, স্লেভ, ইমিগ্রান্ট স্লেভ

গ্যতী– প্যাট্রিসিয়ান ক্লাস... অ্যারিস্টোক্র্যাটস

এর ফলে বিতর্ক আরও ফেনিয়ে উঠল। সমাজসংস্পর্শের প্রশ্ন থেকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী বাছা অবধি সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে বিরোধ, সংঘাত ও বিভাজন নিত্যনতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগল।

অভিধান নিয়ে এই বিরোধের মধ্য দিয়ে কী প্রকাশিত হচ্ছে ? পরম্পরা-বাহিত আপাতনি ভাষার শ্রুতিতে গ্যচি ও গ্যতী-র উদ্ভব যে দুই পূর্বপুরুষ থেকে, তারা একে অপরের সহোদর ভাই। নানা ঘটনাচক্রে তাদের মধ্যে ও সেই সূত্রে তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে নানা পার্থক্য তৈরি হওয়ার আখ্যান আছে, কিন্তু সহযোগিতার ভিত্তির উপর দাঁড়ানো পরম্পরাগত আপাতনি সমাজে তারা সম-অধিকারভুক্ত ছিল। আপাতনিদের পরম্পরাগত ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজকাঠামোর ক্ষয়ের উপর দাঁড়িয়ে গ্যচি-গ্যতী-সম্পর্ক আজ নতুনভাবে সংজ্ঞাত হওয়ার পথে। সহযোগিতামূলক গ্রামসমাজ ভেঙে গিয়ে মাথা তুলেছে হাপোলি-কেন্দ্রীক অর্থাৎ শহর-কেন্দ্রীক সুযোগ-সুবিধা-অধিকারের অসম বিভিন্ন স্তরে ভাঙা একটা উচ্চাবচ ধাপবন্দী কাঠামো। পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-নির্ভরতা-সহযোগিতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কগুলো ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠছে পণ্য-পুঁজি-নির্ভর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার অধীন অসম সম্পর্ক। সবকিছু পণ্যে পরিণত হচ্ছে, জমিও টাকায় কেনাবেচা শুরু হচ্ছে, যৌথ-অধিকারে থাকা চারণভূমি বা জঙ্গল ব্যক্তি-অধিকারে বা রাষ্ট্রের দখলদারিতে চলে যাচ্ছে। ফলে এক বড় অংশ মানুষ জীবনযাপনের উপায়ের উপর অধিকার হারিয়ে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর এক দল মানুষ সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত করে অ্যারিস্টোক্র্যাট বা আপার কাস্ট হিসাবে স্ব-পরিচিতি গঠন করতে চাইছে। সমাজদেহের এই ফাটল চওড়া হচ্ছে।

মিচি বামিন গ্রামের কাছে এক আপাতনি কবরের উপর বাঁশ ও মিঠুনের খুলি দিয়ে তৈরি প্রার্থনা-কাঠামো। ২০০১ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের তোলা ছবি।

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের লেখা 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি'। বইটির প্রকাশক ব্রিল প্রকাশনা সংস্থা। বইটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত।

২। ভেরিয়ার এলউইন -এর লেখা 'এ ফিলজফি ফর নেফা'। বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৭ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। ভেরিয়ার এলউইন -এর লেখা 'মিথস অফ দি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া'। বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। মাইকেল আরম টার ও স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন-এর 'থ্রু দি আই অফ টাইম: ফটোগ্রাফস অফ অরুণাচল প্রদেশ, ১৮৫৯–২০০৬', ব্রিল থেকে ২০০৮-এ প্রকাশিত।